তৃতীয় অধ্যায়

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বাঙালীর সামাজিক ইতিহাস

তৃতীয় অধ্যায়

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বাঙালীর সামাজিক ইতিহাস

বাংলা মঙ্গলকাব্য সাহিত্যের ইতিহাসে মনসামঙ্গল কাব্যধারা সর্ব প্রাচীন হলেও সর্বপ্রধান ধারা অবশ্য চণ্ডীমঙ্গল। মনসামঙ্গলের মতই চণ্ডীমঙ্গল দীর্ঘকাল ধরে বাঙালী সমাজে প্রচলিত এবং জনপ্রিয়তার বিচারেও তা বিশিষ্ট স্থানাধিকারী ছিল। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যকে আমরা মনসামঙ্গল কাব্যের মতই তিনটি ধারায় বিভক্ত করে নিতে পারি, যথাক্রমে— (১) উত্তরবঙ্গীয় ধারা (২) পূর্ববঙ্গীয় ধারা এবং (৩) দক্ষিণ বা পশ্চিমবঙ্গীয় ধারা। উত্তরবঙ্গীয় ধারার প্রধান কবি মানিক দত্ত, পূর্ববঙ্গীয় ধারার কবি দ্বিজ মাধব বা মাধবাচার্য এবং দ্বিজ রামদেব এবং দক্ষিণবঙ্গীয় ধারার কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী।

চণ্ডীপূজার প্রচলন ঃ দেবী মনসার মতই চণ্ডীও কোন পৌরাণিক দেবী নয়, লৌকিক দেবী; এবং মঙ্গলকাব্যের দেবীগণের মধ্যে তার অবয়ব সর্বাপেক্ষা জটিল। দেবী চণ্ডীর প্রকৃত নাম 'অভয়া' এবং চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কবিগণ কাব্যের নাম দিয়েছেন 'অভয়ামঙ্গল'। অভয়া বা চণ্ডী মহিষাসুর বিনাশিনী চণ্ডী নয়, সে অরণ্যবাসিনী, বিন্ধ্যবাসিনী।[১] দেবী চণ্ডী লৌকিক দেবী, ব্রতকথার দেবী; সে পরবর্তীকালে মঙ্গলকাব্যের দেবীতে পরিণত হয়েছে। দেবী চণ্ডী সম্পর্কিত ব্রতকথার কাহিনী-ধারা লক্ষ করে এর মধ্যে একটা সূক্ষ্ম সমাজ বিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। চণ্ডীমঙ্গল কাহিনী-ধারা অপেক্ষাকৃত পরিপুষ্ট কাহিনী, এখানে ধনপতি সংক্রান্ত কাহিনীই মুখ্য, পরবর্তীকালে এর সঙ্গে কালকেতুর কাহিনী যুক্ত হয়েছে। সম্ভবত কালকেতুর কাহিনী ধনপতির কাহিনীর চেয়ে প্রাচীন। তবে ঠিক কোন সময়ে লৌকিক চণ্ডীপূজা প্রচলিত হয়েছিল তা নিয়ে পণ্ডিত মহলে নানা মতভেদ বিদ্যমান। সাহিত্যিক প্রমাণ থেকেই দেখা যায় খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বেই চণ্ডীপূজা বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল এবং ষোড়শ শতাব্দীর কালপর্বেই চণ্ডী মঙ্গলকাব্যের দেবী রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পঞ্চদশ - ষোড়শ শতাব্দীতে সংকলিত পুরাণগুলিতে দেবী চণ্ডীর উল্লেখ আছে। আবার ডঃ সুকুমার সেন আরো জানিয়েছেন, 'ব্যাড়িভক্তিতরঙ্গিনী' যদি পদকর্তা বিদ্যাপতির রচিত হয় তাহলে মঙ্গলচণ্ডীর গান যে পঞ্চদশ শতাব্দীতেই মিথিলায় প্রচলিত ছিল এরূপ অনুমান করা যায়।[২] চৈতন্যদেবের সময়কালে অর্থাৎ পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে যে মঙ্গলচণ্ডীর গীত ও পূজা প্রচলিত ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় বৃন্দাবন দাসের শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থ থেকে। এখানে বলা হয়েছে —

" 'ধর্ম্মকর্ম্ম' লোক, সভে এইমাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে॥
দম্ভ করি বিষহরী পজে কোন জন।
পুত্তলি করয়ে কেহো দিয়া বহুধন॥ (বৃন্দাবন দাস/১১)

শ্রীচৈতন্যদেবের সময়ে মঙ্গলচণ্ডীর গীত এত জনপ্রিয় হলে অনুমান করা যায় চণ্ডীপূজা আরো বেশ কিছু দিন আগেই প্রচলিত হয়েছিল। চণ্ডীপূজার আগে মনসাপূজা প্রচলিত হয়ে থাকবে, বৃন্দাবন দাস শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতে মনসা বা বিষহরি দেবীরও উল্লেখ করেছেন।কিন্তু চৈতন্য-পূর্ববর্তীকালের রচিত কোন চণ্ডীমঙ্গল কাব্য পাওয়া যায়নি।

চণ্ডীমঙ্গলের কবি ও কাব্য ঃ বাংলা মঙ্গলকাব্য সাহিত্যে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যই সর্বাপেক্ষা গঠন পরিপুষ্ট কাব্য। মঙ্গলকাব্যের নির্ধারিত বৈশিষ্ট্য সকলই চণ্ডীমঙ্গলে পাওয়া যায়। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মত চণ্ডীমঙ্গলেও দু'টি খণ্ড—দেবখণ্ড ও নরখণ্ড । দেবখণ্ডে সৃষ্টিতত্ত্ব, নীলাম্বরের অভিশাপ প্রাপ্তি, হরগৌরীর সংসারযাত্রা পর্যন্ত বর্ণিত; নরখণ্ডে দু'টি কাহিনী-আখেটিক খণ্ড বা ব্যাধখণ্ড অর্থাৎ কালকেতুর উপাখ্যান এবং বণিক খণ্ড অর্থাৎ ধনপতি-

শ্রীমন্ত উপাখ্যান। দেবী চণ্ডী প্রকৃতপক্ষে ব্যাধ সম্প্রদায়ের দেবী হিসাবে পূজিত হলেও পরবর্তীকালে উচ্চবর্ণের সমাজে তার পূজা প্রচলিত হয়। অনার্য নিম্নবর্ণের সমাজ থেকে উচ্চবর্ণের সমাজে চণ্ডীপূজা প্রচারিত হল অর্থাৎ প্রকারান্তরে দেবী প্রথমে নিম্নবর্ণের সমাজ এবং পরে উচ্চবর্ণের সমাজে প্রতিষ্ঠা পেল। উচ্চবর্ণের সমাজে প্রতিষ্ঠা না পেলে যথার্থ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব ছিল না। মনসার মতই দেবী চণ্ডী বণিক সম্প্রদায়কে আশ্রয় করে, কারণ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় তখন ক্ষমতাচ্যুত এবং বণিক সমাজ অর্থ কৌলীন্যের জোরে সমাজের শিরোমণি হিসাবে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। অতঃপর আমরা চণ্ডীমঙ্গলের প্রধান প্রধান কবিদের পরিচয় এবং সময়কাল সম্পর্কে আলোচনায় আসব। আমাদের আলোচনার সুবিধার্থে আমরা অবশ্যই সময়ানুক্রমকে অনুসরণ করব।

আঞ্চলিক বিভাজন অনুযায়ী মানিক দত্ত চণ্ডীমঙ্গলের উত্তরবঙ্গীয় ধারার কবি। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আদি কবি মানিক দত্ত; যদিও তাঁর প্রাচীনত্ব নিয়ে পণ্ডিত মহলে নানা সংশয় আছে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী স্বয়ং মানিক দত্তকে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য-ধারার আদি কবি হিসাবে বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। মুকুন্দ চক্রবর্তী লিখেছেন—

"জয়দেব বিদ্যাপতি বন্দো কালীদাস।
কর জুড়ি বন্দিব পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥
মাণিক দত্তকে করিয়ে পরিহার।
বড়ু সর্ব্বানন্দকে করিল নমস্কার।"[৩]

মঙ্গলকাব্যের অনেক কবির মতই মানিক দত্ত আত্মপরিচয় দিয়ে কিছু বলেননি। তাঁর কাব্য পাঠে জানা যায় কবি একই সঙ্গে কানা ও খোঁড়া ছিলেন। সহচরী পদ্মার পরামর্শে দেবী চণ্ডী ফুলফুল্যা নগরের মানিক দত্তকে গীত রচনার নির্দেশ দিয়েছেন। কবি নিজে গায়েন ছিলেন, দল গঠন করে তিনি গান গাইতেন।ডঃ সুনীলকুমার ওঝা মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গলের ভূমিকা অংশে লিখেছেন— "তিনি ১২০৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বের লোক হইতেই পারেন না বরং তাহার অন্ততঃ ১৫০ শত বৎসরের পরের যে কোন সময়ে তাঁহার বর্তমান থাকাই স্বাভাবিক।"[৪] ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' গ্রন্থে জানিয়েছেন—সম্ভবতঃ মানিক দত্তই চণ্ডীমঙ্গলের ধারাটির প্রবর্তক।[৫] আবার ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন— মানিক দত্তের রচনার কোন পুথিই অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে রচিত নয়।[৬] পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে মনসামঙ্গল কাব্য ধারার সৃষ্টি, কিন্তু ঐ সময়ে রচিত কোন চণ্ডীমঙ্গল কাব্য পাওয়া যায়নি। বিভিন্ন সমালোচকদের আলোচনায় মানিক দত্তের সময়কাল হিসাবে ষোড়শ শতকই প্রাধান্য পেয়েছে।

মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল পালাভিত্তিক রচনা।মোট ষোল দিনে গীত পালাগান ষোলটি পালায় রচিত। পালাগুলি নিম্নলিখিত ভাবে বিন্যস্ত—

প্রথম পালাঃ মঙ্গলবার নিশা পালা- এই পালায় বর্ণিত হয়েছে সৃষ্টিতত্ত্ব, দুর্গার সঙ্গে শিবের বিবাহ এবং কার্তিক-গণেশের জন্ম।

দ্বিতীয় পালাঃ বুধবার দিবা পালা- দেবরাজের নিকট দুর্গার পঞ্চদাসী প্রাপ্তি, মর্ত্যে পূজা প্রচারের প্রচেষ্টা, সুরথকে পূজার নির্দেশ, মানিক দত্তকে গীত রচনার নির্দেশ।

তৃতীয় পালাঃ বুধবার নিশা পালা- দেবীর পশু সৃজন, নীলাম্বরের জন্ম ও বিবাহ।

চতুর্থ পালাঃ বৃহস্পতিবার দিবা পালা- নীলাম্বরের অভিশাপ প্রাপ্তি, ব্যাধ হয়ে কালকেতুর জন্ম, বিবাহ, পশুশিকার, পশুদের দেবীর নিকট প্রার্থনা।

পঞ্চম পালাঃ বৃহস্পতিবার নিশা পালা- দেবী কর্তৃক কালকেতুকে ছলনা, ধন

দান ও অবশেষে পূজা প্রচারের নির্দেশ দান।

ষষ্ঠ পালাঃ শুক্রবার দিবা পালা - গুজরাট নগর পত্তন, কলিঙ্গরাজের সহিত কালকেতুর যুদ্ধ, বন্দি ও পরে মুক্তি প্রার্থনা।

সপ্তম পালাঃ শুক্রবার নিশা পালা- দেবীর কৃপায় কালকেতুর মুক্তি প্রাপ্তি এবং পরে দেবীর কৃপায় কালকেতু ফুল্লরার পুত্রলাভ ও স্বর্গে গমন। এই পর্যন্ত মানিক দত্তের কাব্যে 'আখেটিক খণ্ড' এবং এর পরে 'বণিক খণ্ড' সূত্রপাত।

অষ্টম পালাঃ শুক্রবার নিশা পালা- দেবীর চক্রান্তে ধনপতি, লহনা, ফুল্লরার মর্ত্যে জন্মগ্রহণ। ধনপতি-লহনা এবং পরে ধনপতি-খুল্লনা বিবাহ।

নবম পালাঃ শনিবার দিবা পালা- শুক-শারী প্রসঙ্গ, ধনপতির গৌড় গমন ও অবস্থান, লহনা কর্তৃক খুল্লনার লাঞ্ছনা এবং দেবীর সহায়তায় মুক্তিলাভ।

দশম পালাঃ শনিবার নিশা পালা- ধনপতি-খুল্লনা মিলন, শ্রীমন্তের জন্ম ও খুল্লনার পরীক্ষার আয়োজন।

একাদশ পালাঃ রবিবার দিবা পালা- খুল্লনার পরীক্ষা ও জ্ঞাতি ভোজন।

দ্বাদশ পালাঃ রবিবার নিশা পালা- ধনপতির দক্ষিণ পাটন গমন, পথের বিড়ম্বনা, কমলেকামিনী দর্শন ও শেষে বন্দিদশা।

ত্রয়োদশ পালাঃ সোমবার দিবা পালা- ধনপতির প্রতি দেবীর দয়া, খুল্লনার সাধভক্ষণ, শ্রীমন্তের জন্ম, শ্রীমন্তের দক্ষিণ পাটন গমন।

চতুর্দশ পালাঃ সোমবার নিশা পালা- শ্রীমন্তের বিড়ম্বনা, কমলেকামিনী দর্শন, . রাজার নিকট কমলেকামিনী বর্ণনা, বন্ধন ও দক্ষিণ মশানে শিরঃচ্ছেদের ব্যবস্থা, শ্রীমন্তের তর্পণ।

পঞ্চদশ পালাঃ মঙ্গলবার দিবা পালা- শ্রীমন্তের প্রার্থনা ও পরে রাজসৈন্যের সঙ্গে দেবীর যুদ্ধ।

ষোড়শ পালাঃ মঙ্গলবার নিশা পালা- সিংহলরাজের পরাজয়, কমলেকামিনী দর্শন, শ্রীমন্তের বিবাহ, স্বদেশে প্রত্যাগমন, সকলের স্বর্গে গমন।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের পূর্ববঙ্গীয় ধারার অন্যতম কবি হলেন দ্বিজ মাধব; কবির প্রকৃত নাম মাধবাচার্য। দ্বিজ মাধবের কাব্য বাংলা সাহিত্যে সর্ব প্রথম সন-তারিখ যুক্ত চণ্ডীমঙ্গল কাব্য। কবির বাসস্থান গঙ্গাতীরবর্তী সপ্তগ্রাম, পরবর্তীকালে কবি সম্ভবত সপ্তগ্রাম ত্যাগ করে চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। তবে কবির বাসস্থান পূর্ববঙ্গ না পশ্চিমবঙ্গ সে বিষয়ে মতানৈক্য আছে। কবির আত্মবিবরণীতে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানের নাম থাকলেও সেখানে চণ্ডীমঙ্গলের পুথি পাওয়া যায়নি। চট্টগ্রাম অঞ্চলেই মঙ্গলচণ্ডীর গীতের পুথি আবিষ্কৃত হয়েছে এবং কবির রচিত গান ঐ অঞ্চলেই সমধিক প্রচারিত ছিল।[৭] কবি কাব্যে যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন তা থেকে জানা যায় কবির পিতা পরাশর। আত্মপরিচয়জ্ঞাপক শ্লোকে তিনি বলেছেন—

"পরাশর-সুত জান মাধব যে নাম।
কলিকালে হইল জগত অনুপাম॥" (দ্বিজ মাধব/৭)

কাব্যে কবি দ্বিজ মাধব বা মাধবানন্দ এই ভণিতাই বেশী ব্যবহার করেছেন। অনেকে কবির নাম মাধবাচার্য

ব্যবহার করার পক্ষপাতি নন, কারণ শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের রচয়িতাও মাধবাচার্য। ইনিও আত্মপরিচয় সূত্রে 'পরাশর' পুত্র বলে উল্লেখ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের রচয়িতা মাধবাচার্য ষোড়শ শতাব্দীতে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের রচয়িতা মাধবাচার্য এবং মঙ্গলচণ্ডীর গীত কাব্যের রচয়িতা মাধবাচার্য বা দ্বিজ মাধব একই ব্যক্তি কিনা, এ নিয়ে পণ্ডিত মহলে নানা বিতর্ক আছে।[৮] দ্বিজ মাধব তাঁর কাব্যে আত্মপরিচয়জ্ঞাপক শ্লোকে বলেছেন—

"ইন্দু-বিন্দু বাণ ধাতা শক নিয়োজিত ।
দ্বিজ মাধবে গায়ে সারদা-চরিত॥ (দ্বিজ মাধব/২৯৬)

কবিশশাঙ্ক অনুযায়ী ১৫০১ শকাব্দ বা ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দে কবি কাব্যরচনা করেছেন। কবি মোগল সম্রাট আকবর এবং তার সুশাসনের কথা কাব্যে উল্লেখ করেছেন; যদিও ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দে আকবর বাদশা ছিলেন এবং ১৫৭৫-৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশের বিদ্রোহী সুলতান দাউদ খাঁকে পরাজিত করে বাংলাদেশ জয় করেন সুতরাং বলা যায় ষোড়শ শতকের শেষ দিকে দ্বিজ মাধব কাব্যরচনা করেন।[৯] অনেকে অবশ্য কবি প্রদত্ত শ্লোকটিকে প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করেন। ডঃ সুকুমার সেন দ্বিজ মাধব প্রদত্ত কালজ্ঞাপক শ্লোক নিয়ে নানাতর আলোচনা করেছেন এবং তাঁর মতে, দ্বিজ মাধবের কাব্য রচনাকাল ১৬৪৪-১৬৪৫-১৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দ[১০]। ডঃ সেনের সিদ্ধান্ত মেনে নিলে আকবর বাদশার সঙ্গে সঙ্গতি মেলে না, সুতরাং অনেক পণ্ডিত সুকুমার সেনের মন্তব্য গ্রহণ করেননি।[১১]

দ্বিজ মাধবের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের নাম 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত'। কবি নিজের কাব্যকে কোথাও 'সারদামঙ্গল' কোথাও বা 'সারদাচরিত' বলে উল্লেখ করেছেন। সেকালে সম্ভবত 'গীত' বলতে পাঁচালীকেই বোঝানো হত। দ্বিজ মাধবের কাব্য মানিক দত্তের কাব্যের মতই পালাভিত্তিক রচনা। সমগ্র কাব্যটি ষোলটি (১৬) পালায় রচিত । প্রতিটি পালার পৃথক নামকরণ করা হয়েছে এবং প্রতিটি পালা খণ্ড খণ্ড গীতে রচিত। প্রতিটি গীতের উপর রাগ-রাগিণীর উল্লেখ আছে। দ্বিজ মাধবের মঙ্গলচণ্ডীর গীত কাব্যখানি নিম্নরূপে বিন্যস্ত—

প্রথম পালাঃ বন্দনা; এই পালায় আছে গণেশাদি পঞ্চদেবতার বন্দনা, কবির আত্মপরিচয়, সৃষ্টিতত্ত্ব ইত্যাদি।

দ্বিতীয় পালাঃ মঙ্গল-চণ্ডী; এই পালায় আছে মঙ্গল দৈত্যের তপস্যা, বর লাভ, স্বর্গরাজ্য অধিকার, দেবীর মঙ্গলদৈত্য বধ ও মঙ্গলচণ্ডী নাম গ্রহণ।

তৃতীয় পালাঃ মর্ত্য-লীলার সূচনা; এই পালায় আছে দ্বিতীয় বার বন্দনা, ইন্দ্রের ব্যাধি-খণ্ডন, ইন্দ্র কর্তৃক মঙ্গলচণ্ডী পূজা ও দেবীর পঞ্চকন্যা লাভ, কলিঙ্গরাজকে পূজা করতে নির্দেশ, কলিঙ্গরাজ কর্তৃক মঙ্গলচণ্ডী পূজা।

চতুর্থ পালাঃ কালকেতু; এই পালায় আছে নীলাম্বরের অভিশাপ, কালকেতুর জন্ম ও বিবাহ।

পঞ্চম পালাঃ সুবর্ণগোধিকা; এই পালায় আছে ধর্মকেতুর মৃত্যু থকে গুজরাট রাজ্য স্থাপন পর্যন্ত।

ষষ্ঠ পালাঃ ভাঁড়ুদত্ত; এই পালায় আছে গুজরাট নগরে বসতি স্থাপন, কালকেতুর যুদ্ধযাত্রা, কালকেতুর কারাবাস ইত্যাদি।

সপ্তম পালাঃ শাপমুক্তি; কালকেতু কর্তৃক দেবীর স্তব, কারামুক্তি, ভাঁড়ু দত্তের শাস্তি এবং কালকেতুর স্বর্গযাত্রা পর্যন্ত এই পালায় বর্ণিত।

অষ্টম পালাঃ উজানী ও ইছানী; এই পালায় আছে শিবের মধ্যস্থতা থেকে শুরু করে ধনপতির বিবাহ বার্তা পর্যন্ত।

নবম পালাঃ লহনার কুমতি; এই পালায় আছে ধনপতির বিবাহের কথা শুনে লহনার বিলাপ থেকে শুরু করে ধনপতির গৌড়যাত্রা, খুল্লনার ছাগল চরানোর প্রস্তাব পর্যন্ত।

দশম পালাঃ খুল্লনার দেবী পূজা; এখানে আছে খুল্লনার ছাগল চরানো থেকে শুরু করে খুল্লনার দেবী পূজা, ধনপতির স্বদেশে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত।

একাদশ পালাঃ মিলন; স্বামীর সহিত খুল্লনার মিলনের জন্য গমন থেকে শুরু করে মিলন পর্যন্ত।

দ্বাদশ পালাঃ অগ্নিপরীক্ষা; খুল্লনার সন্তান সম্ভাবনা থেকে শুরু করে জ্ঞাতিগণের গুয়াপান গ্রহণে অসম্মতি, খুল্লনার পরীক্ষা প্রদান এবং মালাধরের অভিশাপ পর্যন্ত।

ত্রয়োদশ পালাঃ কমলেকামিনী; ধনপতির সিংহলযাত্রা থেকে আরম্ভ করে শ্রীমন্তের জন্ম পর্যন্ত এই পালায় বর্নিত।

চতুর্দশ পালাঃ শ্রীমন্তের বাল্যলীলা; শ্রীমন্তের বাল্যকথা বর্ণনা থেকে শুরু করে পাঠশালার গুরুমহাশয়ের দুর্ব্যবহার এবং শ্রীমন্তের সিংহল যাত্রা পর্যন্ত এই পালায় বর্ণিত।

পঞ্চদশ পালাঃ শ্রীমন্তের মশান; শ্রীমন্তের যাত্রাপথ বর্ণনা, কমলেকামিনী দর্শন, সিংহলরাজের কাছে কমলেকামিনী বর্ণনা, শ্রীমন্তকে মশানে নিয়ে যাওয়া, দেবীর সহিত সিংহল- রাজের সৈন্যের যুদ্ধ, পিতাপুত্র পরিচয়, সুশীলা-শ্রীমন্তের বিবাহ এবং স্বপ্নদর্শন পর্যন্ত এই পালায় বর্ণিত হয়েছে।

ষোড়শ পালাঃ প্রত্যাবর্তন; এই পালায় আছে ধনপতি শ্রীমন্তের স্বদেশযাত্রা থেকে শুরু করে স্বর্গে গমন পর্যন্ত।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের পূর্ববঙ্গীয় ধারার অপর একজন কবি হলেন দ্বিজ রামদেব। দ্বিজ রামদেব বাংলা সাহিত্যে অজ্ঞাত থাকলেও অনেক পরবর্তীকালে তাঁর কাব্য আবিষ্কৃত হয়েছে ত্রিপুরা অঞ্চল থেকে। কবি সম্ভবত চট্টগ্রাম অঞ্চলের মানুষ ছিলেন, চট্টগ্রাম অঞ্চলের ঐতিহ্য অনুসরণ করেই তাঁর কাব্য রচিত।[১২] দ্বিজ রামদেব জাতিতে ব্রাহ্মণ; কাব্য ভণিতায় কবি মায়ের নাম, বাসস্থান উল্লেখ করেননি, কেবল মাত্র কৌশলে পিতৃনাম ব্যক্ত করেছেন। ভণিতা অংশে কবি বারবার 'কবিবিধুসুত' এই শব্দবন্ধটি ব্যবহার করেছেন। এই অংশটি থেকে অনুমান করা হয়েছে কবির পিতার নাম কবিচন্দ্র। কাব্যের উপসংহার অংশে কবি কাল-নির্ণায়ক শ্লোক দিয়েছেন—

"ইন্দু বাণ ঋষি বাণ বেদ সন জিত।
রচিলেক রামদেবে সারদা চরিত॥" (দ্বিজ রামদেব/৪০৯)

গ্রন্থ সম্পাদক ডঃ আশুতোষ দাসের গণনা অনুসারে, ইন্দু-১, বাণ-৫, ঋষি-৭, বাণ-৫, অর্থাৎ ১৫৭৫ শকাব্দ; 'বেদ সনজিত' এর অর্থ এখানে চার অঙ্ক বেশী হয়েছে অর্থাৎ (১৫৭৫-৪)=১৫৭১ শকাব্দে কবি কাব্য রচনা করেন।[১৩] আবার ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য 'বেদ সনজিত' কথাটিকে 'শক নিয়োজিত' ধরেছেন এবং ডান দিক থেকে গণনা করে ১৫৭৫ শকাব্দ অর্থাৎ ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিজ রামদেবের কাব্য রচনাকাল বলে স্থির করেছেন; [১৪] যদিও শ্লোকটির প্রামাণিকতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়ে থাকে। দ্বিজ রামদেব কাব্যে ফিরিঙ্গি ও মগদের কথা বলেছেন। ফিরিঙ্গি ও মগরা সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে বসতি স্থাপন করে। সুতরাং সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি কোন এক সময়ে দ্বিজ রামদেব তাঁর 'অভয়ামঙ্গল' কাব্য রচনা করেন।[১৫] দ্বিজ রামদেবের 'অভয়ামঙ্গল' কাব্যটি পালাভিত্তিক রচনা নয়; চারটি উপাখ্যান সংযোগে আখ্যানকাব্যটি তৈরী। এই চারটি উপাখ্যান হল–

১। মঙ্গলদৈত্য বধ। ২। চণ্ডীর মর্ত্যে পূজা প্রচারাভিযান ও কালকেতু উপাখ্যান। ৩। ধনপতি উপাখ্যান। ৪। শ্রীপতি উপাখ্যান। প্রতিটি উপাখ্যান ছোট ছোট পদ বা খণ্ড কবিতার সমষ্টি এবং প্রতিটি কবিতার উপর রাগ-রাগিণীর উল্লেখ আছে।

দক্ষিণবঙ্গীয় ধারার কবি এবং মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হলেন মুকুন্দ চক্রবর্তী; তিনি চণ্ডীমঙ্গল কাব্য ধারার শ্রেষ্ঠ কবি; যদিও 'মুকুন্দরাম চক্রবর্তী' নামেই তিনি সমধিক পরিচিত। ডঃ সুকুমার সেনই সর্বপ্রথম 'মুকুন্দরাম' এই নামের বিরুদ্ধে যুক্তি খাড়া করেন। কবিকঙ্কণের ভণিতায় কোথাও 'রাম' অর্থাৎ

'মুকুন্দরাম' নামটি না থাকায় ডঃ সেন ঐ নামে আপত্তি করেছেন। মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যের নাম আসলে 'অভয়ামঙ্গল', এই নামটিই কবি অধিকাংশ ভণিতায় ব্যবহার করেছেন।

মুকুন্দ চক্রবর্তী কাব্যে বিস্তৃত আত্মপরিচয় দিয়েছেন; তাঁর আত্মপরিচয় পাঠে জানা যায় কবি বর্ধমান জেলার সেলিমাবাদ পরগণার দামুন্যা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতামহ জগন্নাথ মিশ্র, পিতা হৃদয় মিশ্র এবং জ্যেষ্ঠ সহোদর কবিচন্দ্র। 'গ্রন্থোৎপত্তির কারণ' অংশে কবি লিখেছেন-

"সহর শিলিমাবাজ তাহাতে সুজনরাজ
নিবসে নিয়োগী গোপীনাথ।
তাঁহার তালুকে বসি দামুন্যায় চাষ চষি
নিবাস পুরুষ ছয় সাত॥"(মুকুন্দ/৩)[১]

আরও জানা যায় মুসলমান কুশাসনের এক বিশেষ পর্বে ডিহিদার মামুদ শরীফের অত্যাচারে কবি সাতপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়েছেন। পথে অবর্ণনীয় দুঃখকষ্টের পর মেদিনীপুর জেলার আড়রায় বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন। বাঁকুড়া রায় তাঁর কবিত্বে মুগ্ধ হয়ে পুত্র রঘুনাথ রায়ের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেন। পরবর্তীকালে রঘুনাথ রায়ের আদেশেই তিনি কাব্যরচনা করেন। কবি মুকুন্দ কাব্যের শেষাংশে কাল-নির্ণায়ক শ্লোক দিয়েছেন–

"শাকে রস রস বেদ শশাঙ্কগণিতা।
কত দিনে দিলা গীত হরের বনিতা॥" (মুকুন্দ/২৪৩)[২]

এই শ্লোক অনুসারে মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্য রচনাকাল ১৪৬৬ শকাব্দ অর্থাৎ (১৪৬৬+৭৮)১৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দ। আবার 'নব রস' ধরলে ১৪৯৯ শকাব্দ অর্থাৎ (১৪৯৯+৭৮)১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দ। কবি কাব্যে মানসিংহের কথা উল্লেখ করেছেন। মানসিংহ বাংলা-উড়িষ্যার সুবাদার ছিলেন ১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। ডঃ সুকুমার সেন কাব্যে উল্লিখিত শ্লোক দুটিকে উপেক্ষা না করে বলতে চেয়েছেন-প্রথমত ঃ 'নয়' অর্থে 'রস' শব্দের ব্যবহার সে সময় ছিল না। দ্বিতীয়ত ঃ ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে রঘুনাথ রায় আড়রায় রাজা ছিলেন। সুতরাং তার অনেক আগেই কবি গৃহত্যাগ করে ছিলেন, কবি যখন আড়বায় উপস্থিত হন তখন রঘুনাথ রায় বালক হবেন, কেননা কবি বাঁকুড়া রায়ের নির্দেশে তার পুত্রের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হয়ে ছিলেন।[১৬] সুকুমার সেনের মতে— "১৫৪৪ অব্দের কিছুকাল পরে মুকুন্দের দেশত্যাগ ঘটনা ধরিলে কোনই অসঙ্গতি হয় না। আসল কথা কালনির্ণয় প্রসঙ্গে মানসিংহকে উপেক্ষা করিতেই হয়।অষ্টমঙ্গলায় প্রাপ্ত কাল সব সংশয় নিরাশ করিয়াছে এবং ১৪৬৬ শকাব্দকে সমর্থন করিয়াছে।"[১৭]

মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'অভয়ামঙ্গল' মঙ্গলকাব্যে আদর্শ স্থানীয় সৃষ্টি, মঙ্গলকাব্যের সমস্ত বৈশিষ্টই এই কাব্যে আছে। কাব্যে দু'টি প্রধান কাহিনী— কালকেতু উপাখ্যান এবং ধনপতি সদাগরের উপাখ্যান। চণ্ডীমঙ্গলের উপাখ্যানে দুটি খণ্ড, দেবখণ্ড ও নরখণ্ড। দেবখণ্ডে আছে পৌরাণিক উপাখ্যান সমূহ আর নরখণ্ডে কালকেতুর কাহিনী ও ধনপতির কাহিনী। কবিকঙ্কণই সমগ্র মধ্যযুগে প্রথম কবি যিনি কাব্যে বহু বিচিত্র উপাদানের সমাহার ঘটিয়েছেন। কবিকঙ্কণ চণ্ডীই সর্বাধিক প্রচারিত, সর্বাধিক জনপ্রিয় কাব্য।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারায় চার জন প্রধান কবি ছাড়াও আরও অনেক অপ্রধান কবি আছেন, তাঁরা হলেন বলরাম শ্রীকবিকঙ্কণ, মুক্তারাম সেন, হরিরাম, ভারতচন্দ্র, জয়নারায়ণ সেন, ভবানীশঙ্কর দাস প্রমুখ। মানিক দত্ত, দ্বিজ মাধব, দ্বিজ রামদেব এবং মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্য পাঠে লক্ষ করা গেল কাহিনীগত ভাবে চারজন কবির কাব্যে কোন পার্থক্য নেই তবে কবি প্রতিভার তারতম্য অনুযায়ী কাব্য দেহ গঠন ও পরিকল্পনার পার্থক্য আছে। দ্বিজ মাধব ও দ্বিজ রামদেব দু'জন কবিই দেবীকে দিয়ে মঙ্গলদৈত্য বধ করিয়েছেন এবং মঙ্গলদৈত্য বধ করে দেবী মঙ্গলচণ্ডী নাম ধারণ করেছে। চরিত্র পরিকল্পনার দিক থেকে কবি প্রতিভার তারতম্য অনুযায়ী পার্থক্য লক্ষ করা

যায়। মানিক দত্ত, দ্বিজ মাধব এবং মুকুন্দ চক্রবর্তী প্রত্যেকেই মুরারী শীল নামে একটি ঠক, প্রবঞ্চক চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। দ্বিজ রামদেব ঐ চরিত্রটির নাম দিয়েছেন সুশীল এবং চরিত্রটির কাব্যে বিশেষ ভূমিকা নেই এবং সে ধূর্তও নয়; তাছাড়া কাহিনী-ধারা মোটামুটি রক্ষিত হয়েছে।

সমাজবৃত্ত ঃ দেবী চণ্ডী পূজা প্রচার করতে গিয়ে মঙ্গলকাব্যের অন্যান্য দেবদেবীর মতই প্রথমে অন্ত্যজ-অনার্যদের আশ্রয় করেছে। ফলে চণ্ডীমঙ্গলে দু'টি স্বতন্ত্র কাহিনী-ধারা সৃষ্টি হয়েছে 'আখেটিক খণ্ড' ও 'বণিক খণ্ড'। 'আখেটিক' কথার অর্থ ব্যাধ। দেবী চণ্ডী অরণ্যচারী ব্যাধ সম্প্রদায়ের দেবী। সেই দেবী ধীরে ধীরে উচ্চবর্ণের সমাজে জায়গা করে নিয়েছে। বণিক খণ্ড অপেক্ষা আখেটিক খণ্ড প্রাচীন বলেই মনে করা হয়, কারণ এখানে ব্যাধ সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার কথা আছে, যা অপেক্ষাকৃত আদিম মানব জাতির বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন। যাইহোক, চণ্ডীমঙ্গলে বর্ণিত বাঙালীর সামাজিক ইতিহাস অন্বেষণ করতে গেলে প্রথমে অনার্য-অন্ত্যজ বাঙালীর জীবনকথা পাই এবং পৃথক ভাবে উচ্চবর্ণের বাঙালীর সমাজ ইতিহাসের তথ্য পাই। কবিগণ আপন সমাজ অভিজ্ঞতা অনুযায়ী সেই ইতিহাস বর্ণনা করেছেন।এখানে লক্ষ করা যায় নিম্নবর্ণের জীবনাচার যেমন উচ্চবর্ণের সমাজ জীবনের প্রবেশ করেছে তেমনি উচ্চবর্ণের জীবনাচারও নিম্নবর্ণের সমাজে প্রবেশ করেছে এবং এই ভাবে সমাজ ইতিহাসের ক্ষেত্রে একটি সমীকরণ তৈরী করেছে। মনসামঙ্গল কাব্যের মতই আমি চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে প্রাপ্ত সামাজিক ইতিহাসের লৌকিক উপাদানগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নিয়ে আলোচনায় অগ্রসর হয়েছি।

বস্তু-কেন্দ্রিক উপাদান ঃ

খাদ্য ও পানীয় ঃ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সামাজিক ইতিহাসের বস্তু-কেন্দ্রিক উপাদানের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই খাদ্য ও পানীয়ের কথায় আসা যাক্। মনসামঙ্গলের মত চণ্ডীমঙ্গলে বাঙালীর খাদ্যাভ্যাসের পরিচয় পাচ্ছি তাই নয়, সেই সঙ্গে রন্ধন প্রণালীর বর্ণনাও পাই। যেহেতু চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে আমরা দু'টি খণ্ডে দু'টি পৃথক সমাজের ছবি পাচ্ছি সুতরাং তাদের পৃথক খাদ্যাভ্যাসের পরিচয়ও পাই। একদিকে অনার্য-ব্যাধ সমাজের খাদ্যাভ্যাস এবং অন্যদিকে বর্ণহিন্দু বাঙালীর খাদ্যাভ্যাস। আমরা প্রথমে উচ্চশ্রেণীর বাঙালী হিন্দুর খাদ্যাভ্যাসের পরিচয় নেব।

চণ্ডীমঙ্গলের দেবী অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীর মতো স্বর্গীয় অমৃতভোগী দেবতা নয়; বরঞ্চ বলা যায় বাঙালী খাদ্যাভ্যাসের ভিতরেই তারা অমৃতের স্বাদ পেয়েছে। চণ্ডীমঙ্গলের শিবঠাকুর ভিখারী, কিন্তু সে ভোজন বিলাসী বাঙালী। উপায় ভিক্ষামাত্র সম্বল, কিন্তু সে স্ত্রী পার্বতীকে মনোমত রন্ধনের ফরমাশ করে। আর মঙ্গলকাব্যের কবি শুধু খাবারের নামই করেননি, রন্ধন প্রণালীও শিখিয়েছেন। মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যে 'হরপার্ব্বতীর কোন্দল', 'খুল্লনার সাধভক্ষণ', 'খুল্লনার রন্ধন', অংশগুলিতে রন্ধনের বিবরণ পাই। বিভিন্ন প্রকার শাকসব্জি মধ্যযুগে খাদ্য হিসাবে জনপ্রিয় ছিল, যেমন— শিম, বেগুন, কুমড়ো, খঞ্জ, পলাকড়ি, মূলা, কাঁঠাল বিচি, ডুমুর, থোড়, মোচা, সজনেখাড়া, মুখীকচু ইত্যাদি; বিভিন্ন প্রকার শাক, যথা— পুঁই, পালং, হেলেঞ্চা, সরষে, বাথুয়া, নিম,কলমী, লাউডগা, গীমা, নটে, কচু ইত্যাদি; নিরামিষ খাদ্য হিসাবে বিভিন্ন প্রকার ডাল, যথা— মুগ, মসুর, অড়হর, বরবটি, ছোলা, মাষ কলাই ইত্যাদি ব্যবহৃত হত। আমিষ জাতীয় খাদ্যের তালিকায় আছে বিভিন্ন প্রকার মাছ ও মাংস, যেমন— পুঁটি, চিংড়ি, বোয়াল, রুই, কাতলা, শোল, পাঁকাল, খলিসা ইত্যাদি; মাংস হিসাবে খাসীর মাংস, পাঁটার মাংস প্রচলিত ছিল। মিষ্টান্নের মধ্যে ছিল দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্যদ্রব্য, যথা— দুধ, দই, পায়েস, ক্ষীর, ছানা; নানা রকম পিঠে, যথা— কলাবড়া, মুগসাউলী, ক্ষীরখোয়া, ক্ষীরপুলি, দুধলাউ, খুদজাউ, নারকেলের ছাঁচ ইত্যাদি অতি লোভনীয় খাদ্যদ্রব্য। বাঙালীর প্রিয় ব্যঞ্জনগুলির মধ্যে— ডাল, সুকুতা, শাক ও শাকের ঘন্ট, মাছের ঝোল-ঝাল, বড়া, চচ্চড়ি, টক বা অম্বল ইত্যাদি। আমড়া, কুল, করঞ্জা, তেঁতুল, আমের আমসি ইত্যাদি দ্বারা টক জাতীয় ব্যঞ্জন তৈরী হত। তাছাড়া বাঙালী রমণীগণের হাতে তৈরী ফুলবড়ি বা কলাই বড়ি অতি উপাদেয় খাদ্য। শুকনো খাদ্যদ্রব্য হিসাবে খই, মুড়ি, চিড়া, চালভাজা, গুড় ইত্যাদি ব্যবহৃত হত, ফলার ভোজনে রসনাপ্রিয় বাঙালী দুধ, দই, মহিষা

দই, সন্দেশ ব্যবহার করত। রন্ধনকার্যে বিভিন্ন প্রকার তেল— বিশেষত, তিল তেল, সরিষার তেল, ঘি ব্যবহৃত হত। রসনাপ্রিয় বাঙালী রান্নায় নানা প্রকার মসলা, যেমন— মরিচ, আদা, ঘি, ডাবের জল, জামিরের রস, জিরা, মেথী, কালজিরা, কর্পুর, লবণ, লবঙ্গ, কাসুন্দি, সরিষা, হিঙ্গ, জোয়ান, চই, তেজপাতা, মুহুরী, হলুদ ইত্যাদি ব্যবহার করত। বাঙালীর রন্ধনে নিজস্ব কৌম বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। মঙ্গলকাব্যের কবিগণ যে রন্ধন বিদ্যায় সম্যক পারদর্শী ছিলেন তার পরিচয় পাই মঙ্গলকাব্যে। চণ্ডীমঙ্গলের কবিগণের মধ্যে মুকুন্দ চক্রবর্তী সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রন্ধন বর্ণনা দিয়েছেন। মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গলে যে রন্ধনের বর্ননা পাই তা অত্যন্ত সরল, মানিক দত্তের কাব্যে বর্ণিত খুল্লনার রন্ধনের কিছু অংশ—

"অগ্নি জালি কাষ্ঠ দেএ নাই করে হেলা।
রন্ধন করিল অন্ন চড়াঞা পাএলা।
তৈলে বার্ত্তাকী ভাজে কই মচ্ছের পোড়া।
কলা দিঞা রন্ধন করিল কলা বড়া॥
রূহিত মচ্ছের ভাজা কিছু কৈল ঝোল।
নানা জাতি মচ্ছ্য ভাজে চিতলের কোল॥
দালির আম্বল করি কটয়া ভরিল।
নানা জাতি বেঞ্জন রন্ধন করিল॥" (মানিক/২৩৪)

রন্ধনকার্যে বাঙালী রমণীগণ প্রথমে নিরামিষ ব্যঞ্জন, তারপর আমিষ এবং শেষে টক বা অম্বল ব্যঞ্জন এবং মিষ্টান্ন রন্ধন করত। যেমন দ্বিজ মাধবের কাব্যে লহনার রন্ধনের বিবরণ—

"শাক রন্ধন করি ওলাইল বিশেষে॥
মুগ ব্যঞ্জন রাঁধে ঘৃতেত আগল।
জাতি কলা দিয়া রান্ধে ঝুনা নারিকেল॥
নিরামিষ ব্যঞ্জন রান্ধি থুইল একুভিতে ।
আমিষ রান্ধিতে লহনা দিল চিতে॥
মনের হরিষে রান্ধে রোহিতের মাছ।
দুরিতা মিশালে রান্ধে উরিচা আনাজ॥
জলপাই অম্বল রান্ধে হরষিত হইয়া।
সম্ভারি ওলাইল তাহে সউর্ষ পোড়া দিয়া॥
বড় বড় শুরুল মৎস্য ভাজয়ে বিশেষে।
সুগন্ধি তণ্ডুল অন্ন রান্ধে অবশেষে॥" (দ্বিজ মাধব/১৫৬)

কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে 'হরগৌরীর কোন্দল' অংশে নিরামিষ রন্ধনের বিস্তৃত তালিকা আছে—

" আজি গৌরী রান্ধিয়া দিবেক মনোমত।
নিম শিম বেগুণে রান্ধিয়া দিবে তিত॥
. . . . . .
গোটা কাসুন্দিতে দিবা জামিরের রস।
এবেলার মত রান্ধ এ ব্যঞ্জন দশ॥" (মুকুন্দ/২৩)[৩]

কবিকঙ্কণ চণ্ডীর বণিক খণ্ডে 'খুল্লনার রন্ধন' অংশে নিরামিষ-আমিষ-মিষ্টান্ন সকল প্রকার রন্ধনের বিবরণ আছে। এখানে শাকসব্জি, মাছ-মাংসের বিচিত্র ব্যঞ্জনের পরিচয় পাই, যথা—

প্রভুর আদেশ ধরি রান্ধয়ে খুল্লনা নারী
স্মরিলা সর্ব্বমঙ্গলা।
তৈল ঘি লবণ ঝাল আদি নানা বস্তুজাল
সহচরী যোগায় দুর্ব্বলা॥
. . . . . .
অন্ন রান্ধে সব শেষে শ্রীকবিকঙ্কণ ভাষে
পণ্ডিত রন্ধন-উপদেশ॥" (ঐ/১২৭)[৪]

দ্বিজ রামদেবের 'অভয়ামঙ্গল' কাব্যেও খুল্লনার রন্ধনের বিবরণ পাই —

"মহানন্দে খুলনাএ চড়াএ রন্ধন।
. . . . . .
পাঅস পিষ্টক কথ সাধুর বাঞ্ছিত।
দুবলার আদেশ রামা পালে সমাহিত॥" (রামদেব/১৯৬-১৯৭)

আহারকালে খাদ্য পরিবেশনে বাঙালীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল। বাঙালী সাধারণত মেঝেতে আসন বা পিঁড়ি পেতে আহার করত। প্রথমে জলছড়া দিয়ে আহারের স্থান শুদ্ধ করা হত, তারপর আসন পেতে পাশে জলের পাত্র স্থাপন করা হত এবং থালায় অন্ন, বাটিতে বিবিধ ব্যঞ্জন সাজিয়ে থালার চারিদিকে স্থাপন করা হত। বাঙালী গৃহিণীরা আচমনের জলপাত্র তৈরী রাখতে ভুলত না। দ্বিজ রামদেবের কাব্যে আমরা এক সুন্দর আহার চিত্র পাই—

"স্থলশুদ্ধি করি পাতে কাঞ্চনের আসন॥
সুবর্ণের থালা দিল রজতের বেড়ি।
সুবাসিত বারিপূর্ণ দিল হেম ঝারি॥
কাঞ্চনের খোরা যথ পাতের চারিভিত।
খড়িহা দিলেক সেবক আধার সহিত।
হেম বাটি ভরি রাখে নবনী চারু।
রজত ডাবর দিল আচমনি গাড়ু॥ (রামদেব/১৯৭-১৯৮)

আহারকালে পরিবেশনে বা আহারের নিয়ম অনুসারে প্রথমে তিক্ত তারপর আমিষ এবং শেষে মিষ্টান্ন ও ফলমূল পরিবেশন করা হত। কবিকঙ্কণ লিখেছেন—

"ভোজনে বসিল তবে জ্ঞাতি বন্ধুজন।
খুল্লনা কনকথালে যোগায় ওদন॥
প্রথম সুক্তার ঝোল দিল ঘন্ট শাক।
. . . . . .
দধি পিঠা খাইল সবে মধুর পায়স।
রসাল পনস-কোষ রসালের রস॥" (মুকুন্দ/১২৭)[৫]

আহারান্তে তাম্বুল ভক্ষণ করা বাঙালীর অভ্যাস। মঙ্গলকাব্যে তাম্বুল বা পানের বহুল ব্যবহার দেখা যায়। মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেও পানের ব্যবহারের কথা পাই—

"একস্থানে বসিলেন জত জ্ঞাতিগণ।
কর্পূর তাম্বুলে কৈল মুখের শোধন॥" (মানিক/২৫৬)

মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গলেও এই তথ্য পাই। যেমন—

"ভোজন করিয়া আর মনকুতুহলে।
কর্পূর তাম্বুল খায় হাসি খল খলে॥" (মুকুন্দ/১২৮)[৬]

বাঙালী অতিথিপরায়ণ, সুতরাং প্রথমে অতিথিকে ভোজন করিয়ে শেষে গৃহস্থ ভোজন করত—

"সাধু বলে দুয়ারে ভুঞ্জাও বন্ধুজন।
অবশেষে গৃহস্থের উচিত ভোজন॥"(ঐ/১২৭)[৭]

শুধু তাই নয়, গৃহস্থ বাড়িতে প্রথমে বয়োজ্যেষ্ঠরা ভোজন করত এবং তারপর অন্যান্যরা ভোজন করত । ব্যাধ সমাজেও উচ্চশ্রেণীর বাঙালীর এই রীতি প্রচলিত হয়েছিল। কালকেতুর জননী নিদয়া তাই বলেছে—

"নিদয়ার আজ্ঞা ধরে ফুল্লরা রন্ধন করে।
আগে ধর্ম্মকেতুর ভোজন॥" (ঐ/৩৯)[৮]

চণ্ডীমঙ্গলে শুধু উচ্চশ্রেণীর কথাই নেই নিম্নশ্রেণীর ব্যাধ সম্প্রদায়ের বাঙালীর খাদ্য রীতির কথাও পাওয়া যায়। ব্যাধ শ্রেণীর বাঙালীর আহার ও খাদ্যদ্রব্য ছিল খুব সাধারণ। তারা সাধারণত পান্তা-আমানি, ভাত, খুদ-জাউ, বিভিন্ন প্রকার ডাল; বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি— বন-পুঁই, কলমী, বন-ওল, করঞ্জা, আমড়া, কচু; বিভিন্ন ধরনের বন্যপ্রাণীর মাংস— হরিণ, সজারু, বন-মোরগ, শূকর, নেউল, গুইসাপ ইত্যাদি, এমন কি গিরগিটির মাংসও খেত। তাছাড়া দুধ ও দধি খেত। দ্বিজ মাধবের কাব্যে কালকেতুর যে ভোজন চিত্র পাই তার বর্ণনা নিম্নরূপ-

"পাত লইয়া ভোজনে বসিল বীরমণি।
অন্ন পরিবেশন করে ফুল্লরা ব্যাধিনী॥
বারে বারে ফুলরায়ে অন্ন দিয়া যায়ে।
ফিরিয়া চাহিতে নারে খাইয়া ফেলায়ে॥" (দ্বিজ মাধব/৪৫)

কবিকঙ্কণের কাব্যে ব্যাধ সমাজের খাদ্যের সুন্দর চিত্র পাই 'কালকেতুর ভোজন' অংশে—

"চারি হাঁড়ি মহাবীর খায় ক্ষুদ-জাউ।
ছয় হাঁড়ি মসুর মিশাইয়া লাউ॥
ঝুড়ি দুই তিন খায় বন-ওল পোড়া।
বন-পুঁই ভার দুই কলমি কাঁচড়া॥
. . . . . .
এনেছি হরিণ দিয়া দধি এক হাঁড়ি।
তাহা দিয়া খায় বীর ভাত তিন কাঁড়ি॥ (মুকুন্দ /৪০)[৯]

'নিদয়ার সাধভক্ষণ' অংশে বিস্তৃত খাদ্যতালিকা পাই। যেমন—

"আপনার মত পাই তবে গ্রাস দুই খাই
পোড়া মাছে জামিরের রস।
.. ..
মূলা বেগুনেতে সিম তাহে রান্ধ দিয়া নিম
তাহে দেও উড়ুম্বর ফল॥" (ঐ/৩৫)[১০]

ব্যাধ সমাজের দারিদ্র্যময় জীবনযাত্রায় ভাত-জলই সম্বল মাত্র। দ্বিজ রামদেবের কাব্যে ব্যাধ সমাজের যে আহারের চিত্র পাই তা এরকম—

"বাসি অন্ন আনে রামা দিআ তরাতরি।

জল সমে ঢালে অন্ন পাতে শীঘ্র করি॥
আছে বা না আছে অন্ন পূর্ণ বাসি জলে।
স্থালীসঙ্গে আনি তাহা বীরের পাতে ঢালে॥" (দ্বিজ রামদেব/৫৭)

দ্বিজ মাধবের কাব্যে ব্যাধ ঘরের রন্ধন প্রক্রিয়ার বাস্তব চিত্র পাই। যেমন—

"পাবক জ্বালয়ে রামা হয়ে হরষিত।
পাকা কলার মূল রান্ধে লবণ বর্জিত॥
পাকা পুঁইর শাক রান্ধে পিঠালের মেলে।
সম্ভারি তুলাইল তাহা শুকরের তৈলে॥
কৃষ্ণসারের মাংস রান্ধে হরষিত মন।
ক্ষুদ্র তণ্ডুলের অন্ন জোগায় তখন॥" (দ্বিজ মাধব/৪০)

অনার্য ব্যাধ সম্প্রদায়ের মানুষ সাধারণত মৃৎপাত্র, নারকেলের খোল, মানকচুর পাতা, কলাপাতা ইত্যাদিতে আহার করত। যেমন এরকম চিত্র পাওয়া যাচ্ছে—

"ফুলরা রন্ধন করে বীরে খাইতে ভাত।
তরাতরি আনিলেক মানকচুর পাত॥"(ঐ/৪৫)

কবিকঙ্কণের কাব্যে 'কালকেতুর ভোজন' অংশে এই চিত্র পাই—

"সম্ভ্রমে বসিতে দিল হরিণের ছড়া॥
মোকা নারিকেলেতে পূরিয়া দিল জল।
ঝাঁটি জল দিয়া কৈল ভোজনের স্থল॥
. . . . . .
সম্ভ্রমে ফুল্লরা দিল মাটিয়া পাথরা।
ব্যঞ্জনের তরে দিল নূতন খাবরা॥" (মুকুন্দ/৩৯)[১১]

গৃহস্থালী দ্রব্য ঃ অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেও বাঙালীর লৌকিক জীবনে ব্যবহৃত গৃহস্থালীর নিত্যপ্রয়োজনীয় নানান জিনিসপত্র ব্যবহারের কথা পাওয়া যায়, যেমন— হাঁড়ি, কলসী, থালা, বাটি, , ঘটি, জাঁতা, চুপড়ি, সাজি, ঝাঁটা, ডাবর, খাট, পালঙ্ক , ছাতা, প্রদীপ ইত্যাদি। বিভিন্ন সময়েও যেগুলির ব্যবহারগত কোন পরিবর্তন ঘটেনি, এমন কি আজও সেগুলি সমান ভাবে ব্যবহৃত হয়ে চলেছে। হাঁড়ি একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় গৃহস্থালীর উপকরণ, তার সুপ্রচুর ব্যবহার আছে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে, যেমন—

"নিদ্রার কারণে কিছু না শুনে খুলনী।
মুখেতে ঢালিয়া দিল ভাঙ্গা হাড়ীর পানি॥" (দ্বিজ মাধব/১৪৩)

কিংবা কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে রন্ধনপাত্র হিসাবে হাঁড়ির ব্যবহার দেখা যায়—

"বেসাতি দুর্ব্বলা জানে অবশেষে হাঁড়ি কিনে
মেগে লয় ভারে কিছু ভাট॥" (মুকুন্দ/১২৬)[১২]

মাটির হাঁড়ি ছাড়া ঘট, সরা, কলসী ইত্যাদির ব্যবহার করা হত। তাইতো উপযুক্ত পাত্রপাত্রীর কথা বলতে গিয়ে মঙ্গলকাব্যের কবি হাঁড়ির মুখে সরার উপমা দিয়েছেন—

"সেই বর-যোগ্যা কন্যা তোমার ফুল্লরা।
চাহিয়া পাইলা যেন হাঁড়ি আর সরা॥" (ঐ/৩৭)[১৩]

সাধারণত জলপাত্র হিসাবে ঘট ব্যবহার করা হত, তাছাড়া পূজা-পার্বণে ঘটের ব্যবহার করা হত। কবিকঙ্কণের

কাব্যে ঘটের ব্যবহার পাই, সমৃদ্ধি বোঝাতে এখানে হেম-ঘটের ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন—

"রঙ্ক দুঃখী নাহি জানি হেম ঘটে পিয়ে পানী
নাট গীত সবাকার ঘরে॥" (ঐ/৭৩)[১৪]

কলস একটি অতি প্রয়োজনীয় জলপাত্র। সাধারণত মাটির কলসই ব্যবহৃত হত। চণ্ডীমঙ্গলে তার ব্যবহার আছে-

"হেনকালে মায়া তবে করিল ভবানী।
কলসে আছিল জল সুখাইল আপনি॥" (মানিক/১৯৮)

গাড়ু নলযুক্ত এক প্রকার পাত্র, জল ঢেলে ব্যবহার করার কাজে এটি অতি উত্তম—

"এক গাড়ু জল রম্ভা ভরাইল।
খুলুনার হাতে জল পণ্ডিতকে দিল॥" (ঐ/১৯৯)

ব্যবহার্য পাত্র হিসাবে থালার ব্যবহার অতি সুবিদিত। আহার করার জন্য থালা, বাটি ইত্যাদি ব্যবহৃত হত। ধনীর প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্য বোঝাতে সোনার থালা ও বাটির ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন-

"অন্নব্যঞ্জনে বামা রন্ধনে বসিল।
সুবর্ণের থালে বেঞ্জন সম্বরিল॥" (ঐ/২৫৬)

কিংবা মুকুন্দের কাব্যে কালকেতুর অবস্থার উন্নতি বোঝাতে ভাঁড়ু দত্তের বক্তব্য—

"ভাণ্ডে পূর্ব্বে পিত বারি এবে তার হেম ঝারি
বাটি ঘটি থালা হেমময়॥" (মুকুন্দ/৭৩)[১৫]

মাটির থালা, বাটি, খাবরা ইত্যাদি ব্যবহার হত সাধারণ মানুষের ঘরেও। মাটির থালাকে 'পাথরা' বলা হত; কালকেতুর ঘরে মাটির পাথরা আর খাবরাই সম্বল। সাজি ফুল তোলার কাজে ব্যবহার করা হত, ধর্মপ্রাণ বাঙালীর তাই সাজির প্রয়োজন হত। ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বর শিবপূজার ফুল তুলতে গিয়েছিল—

"সাজি আঁকুড়ি হাতে চলিল কানন-পথে
সোঙরিয়া ভবানীশঙ্কর।" (ঐ/৩০)[১৬]

ডালা বা চুপড়ির ব্যবহার হত। সাধারণত বাঁশ ও বেত দিয়ে তৈরী হত ডালা, চুপড়ি ইত্যাদি। তৈজসপত্র রাখার জন্য বা বিভিন্ন জিনিসপত্র বহন করার জন্য ডালা ব্যবহার হত। মানিক দত্তের কাব্যে দেখি ফুল্লরা ডালায় মাংস বেচাকেনা করে—

"মাথায় মাংসের ডালি নগর বাজারে জাব
কম্পিত হৈবে মহাজন॥
ফুলরার রূপ হৈল বিরহালী মাথায়ে মাংসের ডালি
. . . . . নগর বাজারে। (মানিক/৭১)

অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের ডালাকে চুপড়ি বলা হয়। তার ব্যবহারও লক্ষ করা যায় চণ্ডীমঙ্গলে যেমন—

"চুপড়ি ভরিয়া নিল কদলীর মোচা।" (মুকুন্দ/৭৩)[১৭]

ঝুরিও ডালা বা চুপড়ির মতই বাঁশ ও বেত নির্মিত এক প্রকার নিত্যব্যবহার্য উপকরণ। কালকেতুর আহারের কথা বলতে গিয়ে ঝুড়ি ব্যবহারের কথা এসেছে। দেউটি বা প্রদীপ বাঙালীর নিত্যব্যবহার্য উপকরণ, মধ্যযুগে বাঙালীর ঘরে প্রদীপের আলোই একমাত্র সম্বল ছিল। তাছাড়া মাঙ্গলিক কর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিল প্রদীপ বা দেউটি । যেমন—

"দুই দিকে দেউটি জ্বলয়ে সারি সারি।
অগুরু চন্দন বামা নিল বাটি পূরি॥ (ঐ/১২৯)

পানের বাটা: ডাবর বাঙালীর ঘরে ব্যবহার্য একটি উপকরণ, মধ্যযুগে তার ব্যবহার হত। ডাবর হল পিকদানী বা

আচমন পাত্র—

"নিরামিষ অন্ন দোঁহে করিল ভোজন।
ফিরিয়া ডাবরে সাধু কৈল আচমন॥" (ঐ/১৩৭)[১৮]

বাটা হল পান রাখার পাত্র। মধ্যযুগে বাটা একটি প্রয়োজনীয় বাসন হিসাবে ব্যবহৃত হত; চণ্ডীমঙ্গলে তার উল্লেখ পাই—

"এক বাটা পান লইয়া জামাতা ভেট তুমি।" (মানিক/১৯৮)

এছাড়া পিঁড়ি ও ঢেঁকি ইত্যাদি ব্যবহার করা হত মধ্যযুগের বাঙালী সমাজে । সাধারণত বাঙালী ঘরে পিঁড়ি বা আসন পেতে আহার করার রীতি ছিল। ধনপতির গৃহে আহারকালে পিঁড়ির ব্যবহার দেখি—

"স্বর্ণ থালা পিড়ি আনি জোগায়ে দুবা দাসী॥" (দ্বিজ মাধব/১৫৬)

অনার্য ব্যাধেরা পশুর চামড়ার আসন ব্যবহার করত। উচ্চশ্রেণীর বাঙালী ঘরে সুদৃশ আসন ব্যবহার হত, কালকেতুর ঘরে হরিণের চামড়ার আসনে কালকেতুকে বসতে দেওয়া হয়েছে। ঢেঁকির ব্যবহার প্রায় সকল মঙ্গলকাব্যেই দেখা যায়, ধান ভেঙে চাল তৈরীর কাজ বাঙালী মেয়েদের ; তাই স্বাভাবিক ভাবে বাঙালী জীবনের উপকরণ হিসাবে ঢেঁকির কথা এসেছে। মানিক দত্ত অকর্মণ্য ব্যক্তির কথা বলতে গিয়ে ঢেঁকির উপমা দিয়েছেন। যেমন—

"চাষাগুলা ভাঙ্গ মরিবারে খায়।
ঢেঁকির মত পড়িয়া চখোয়ার মত চায়॥" (মানিক/৪৫)

ঢেঁকির উপযোগিতার জন্যই বাঙালী ঘরে ঢেঁকির জন্য ঢেঁকিশাল থাকত। আমরা চণ্ডীমঙ্গলে দেখি খুল্লনাকে ঢেঁকিশালে শুতে দেওয়া হয়েছে—

"দিন অবসানে খুদের অন্ন খাই।
ঢেকিশালে খঞিয়া পাতি রজনী গোঁয়াই॥" (দ্বিজ মাধব/১৪৪)

প্রতিটি চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেই ঢেঁকি এবং খুল্লনার ঢেঁকিশালে বাস করার প্রসঙ্গটি পাওয়া যায়। এসমস্ত উপকরণগুলি ছাড়া ডালা, কুলা, ডোল, ছাতা, দড়ি, চাক, চামর, আসন, পাটি, ধুচুনি, ঝারি,তরাজু ইত্যাদি নানা নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ব্যবহারের কথা ছড়িয়ে ছিঁটিয়ে আছে। ওজন পরিমাপের জন্য তরাজু ব্যবহার হত—

মনে বড় কুতূহলী কান্ধেতে কড়ি থলী
হড়পী তরাজু করি হাতে॥"(মুকুন্দ/৫৮)

জিনিসপত্র সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সিন্দুক ব্যবহার হত। চণ্ডীমঙ্গলে তার ব্যবহার আছে-

"সিন্দুক হৈতে বেণে গুণে দেয় টাকা।" (ঐ/৫৯)[১৯]

ডোল হল শস্য সংরক্ষণের নিমিত্ত বাঁশের তৈরী এক প্রকার বড় পাত্র। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে পাই শস্য সংরক্ষণের ডোলের কথা। শৌখিনদ্রব্য হিসাবে খাট, পালঙ্ক, চামর, বিয়নী; রূপচর্চার উপকরণ হিসেবে দর্পণ, চিরুণী ইত্যাদি ব্যবহৃত হত। অপেক্ষাকৃত নিরুপদ্রব সুখের সংসারে এসবের ব্যবহার লক্ষণীয়। প্রসাধনে সহায়ক উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করা ছাড়াও দর্পণ, চামর, শঙ্খ ইত্যাদি দ্রব্যগুলি বাঙালীর গার্হস্থ্য জীবনে বিভিন্ন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে এগুলির প্রয়োজন হত—

"রজত দর্পণ হেম স্বস্তিক সিন্দুর ক্ষেম
কজ্জ্বল গোরোচনা যথাবিধি॥
সিদ্ধার্থ চামর শঙ্খ ভুবনে উপমা রঙ্ক
পূর্ণপাত্র প্রদীপ ভূষিত॥" (ঐ/৯৯)[২০]

যুদ্ধাস্ত্রগুলি ছাড়াও গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন রকমের অস্ত্র ব্যবহার হত।যেমন, ক্ষুর, বঁটি, কাটারি, কুঠার বা পরশু, জাঁতি ইত্যাদি। ক্ষুর ব্যবহার করত নাপিতরা চুল-দাড়ি কামাবার জন্য। ভাঁড়ু দত্তকে অপদস্ত করে শেষ পর্যন্ত তার মাথা কামানো হয়েছিল—

"হরিয়া নাপিতে বীর দিল আঁখিঠার।
মনের হরিষে ক্ষুর আনে মুড়াধার॥
. . . . . .
চামাটি থাকিতে পদতলে ঘসে ক্ষুর।
দেখিয়া ভাঁড়ুর প্রাণ করে দুড় দুড়॥" (ঐ/৮৮)[২১]

কৃষিজীবী সমাজে কোদাল, খন্তা, লাঙল, জোয়াল, ফাল ইত্যাদি অতি প্রয়োজনীয় গৃহস্থালীতে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি। মানিক দত্ত চাষের যন্ত্রপাতির উল্লেখ করেছেন—

"জোয়াল নাঙ্গল ভাসে কোদালি আর ফাল।" (মানিক/১২৯)

মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যে চণ্ডীমঙ্গলে দেবী প্রদত্ত ধন তুলতে গিয়ে কালকেতু ঐ সমস্ত অস্ত্রাদি ব্যবহার করেছিল—

"অভয়া বলেন বাছা লহ শিকা ভার।
লহ ঝুড়ি কোদালি খনতা ক্ষুরধার॥
কোদালি খনতা মাতা না পাব নিয়ড়ে।
তুমি আজ্ঞা দিলে ধন খুঁড়িব চিয়াড়ে॥" (মুকুন্দ/৫৭)[২২]

'শিকা-ভার' কৃষিজীবী সমাজ সম্পর্কিত ব্যবহার্য উপকরণ। একটি বাঁশের বাঁকে দু'দিকে দড়ির তৈরী শিকাতে ঝুলন্ত ডালায় জিনিসপত্র পরিবহন করা হয়, লোকে কাঁধে করে ভার বহন করে। বঁটির ব্যবহার আছে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে,বঁটি গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহৃত একটি নিত্যপ্রয়োজনীয় অস্ত্র। ফুল্লরা গোধার মাংস কাটার জন্য বঁটি ধার করতে সইয়ের বাড়ী গিয়েছে—

"গোধিকা কারণে রামা চিন্তিত অন্তর।
কিমতে কাটিমু গোধা বঠি নাই ঘর॥ (রামদেব/৬৩)

দ্বিজ মাধবের কাব্যেও বটির প্রসঙ্গ আছে। কাটারি একটি প্রয়োজনীয় অস্ত্র, গৃহস্থালীর নানা কর্মে কাটারির প্রয়োজন হয়। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে তার ব্যবহার আছে—

"জয়২ খুলুনা ভূমিষ্ট হইল।
সুবন্ন কাটারি দিয়া নাড়ি ছেদ কৈল॥" (মানিক/১৯১)

জিঞ্জির বা শেকল একটি প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, বন্দিদের বেঁধে রাখার জন্য শেকল ব্যবহার করা হত। বন্দি কালকেতুকে কারাগারে শেকলে বেঁধে রাখা হয়েছিল-

"লোহার শিকলে বান্ধে হাত আর পায়ে।" (দ্বিজ মাধব/৯৪)

যুদ্ধাস্ত্র ঃ মনসামঙ্গল এবং চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে যুদ্ধ বর্ণনা তেমন নেই; তবু দেখা যায় মনসামঙ্গলের মত চণ্ডীমঙ্গলেও সামান্য যুদ্ধ বর্ণনার প্রসঙ্গ এসেছে, যেমন কালকেতুর কাহিনীতে কালকেতুর সঙ্গে কলিঙ্গরাজের যুদ্ধ এবং বনিক খণ্ডে সিংহলরাজের সৈন্যদের সঙ্গে দেবীর যুদ্ধ। এই যুদ্ধ বর্ণনা গতানুগতিক হলেও এতে সেকালে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহারের কথা পাওয়া যায়। চণ্ডীমঙ্গল যে যুগে রচিত হয়েছিল সে সময় সামাজিক জীবনে যুদ্ধের প্রভাব অনেকটা হ্রাস পেয়েছিল। ফলে এখানে যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহারের কথা কম। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধাস্ত্র ও সাজসরঞ্জাম ব্যবহারের কথা পাই যা সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ হিসাবে গণ্য হতে পারে, যেমন- তীর, ধনুক, চিয়াড়, ভূষণ্ডী, ডাঙ্গস, কামান, বন্দুক, শোল, টাঙ্গী,মুদ্গর, মুসল ইত্যাদি।

মঙ্গলকাব্যে যুদ্ধ বর্ণনা যেমন গতানুগতিক তেমনি যুদ্ধাস্ত্রগুলিও প্রাচীন, তবে চণ্ডীমঙ্গলে আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র কামান ও বন্দুকের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। বন্দুকের ব্যবহার চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রথম যুগেও হয়েছিল। মানিক দত্তের কাব্যে বন্দুকের ব্যবহার দেখা যায়—

"ধনুকের ছটপটি পাইকে ডাক ছাড়ে।
বন্দুকের শব্দে পৃথিবী টলমল করে॥" (মানিক/১৪০)

এছাড়া কামানের ব্যবহারও দেখা যায় চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে। যেমন—

"ধানুকি পিষ্টেত টোন ধনুকে চড়াইয়া গুণ
কামানি কামান করে সাজ।
চামুকি সাজাএ যে চমকে আনল যে
ছোটে গুলী ছোটের আওয়াজ॥" (রামদেব/৯১)

এছাড়া প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োগ ছিল অধিক, যেমন— তবক, বেলক, টাঙ্গী, কৃপাণ, মুদ্গার ইত্যাদি। মুকুন্দের কাব্যে পাই—

"তবক বেলক টাঙ্গি কামান কৃপাণ।" (মুকুন্দ/৭৬)[২৩]

অথবা—

"দেয়াড় চিয়াড় বাণ করবাল খরশাণ
ভূষণ্ডী ডাঙ্গস চক্রবাণ।" (ঐ)[২৪]

সাজসজ্জা ঃ বাঙালীর সামাজিক ইতিহাস বা লৌকিক ইতিহাসের একটি অন্যতম উপকরণ পোশাক-পরিচ্ছদ। মধ্যযুগীয় বাঙালীর পোশাক-পরিচ্ছদের পরিচয় জানা যায় চণ্ডীমঙ্গল কাব্য থেকে। বাঙালীর সাধারণ পোশাক-পরিচ্ছদের পাশাপাশি বিভিন্ন অনুষ্ঠান উৎসবে বিভিন্ন ধরনের শৌখিন বস্ত্র, গহনা-অলঙ্কার, ব্যবহার করত তার মোটামুটি পরিচয় পাই চণ্ডীমঙ্গল কাব্য থেকে। বাঙালী গড়পরতা পোশাক হিসাবে পুরুষরা ধুতি পরিধান করত আর নারীর পোশাক হল শাড়ী বা পট্টশাড়ী। তাছাড়া পুরুষরা জামা, জুতা বা পাদুকা, পাগড়ী, টুপি ব্যবহার করত। উৎসব অনুষ্ঠানে নারীগণ পাটশাড়ী নামে শৌখিন শাড়ী ব্যবহার করত । দরিদ্র নারী পুরুষ কোন রকমে ছেঁড়া কাপড়ে (খুঞার বসন) লজ্জা নিবারণ করত। সাধু-সন্ন্যাসীরা পশুর চামড়ার তৈরী এক জাতীয় পোশাক ব্যবহার করত।

বাঙালী নারীর সাধারণ পোশাক হল শাড়ী। প্রতিটি মঙ্গলকাব্যেই শাড়ীর ব্যবহার লক্ষণীয়। বিবাহ উৎসব অনুষ্ঠানে পট্টশাড়ী বা পাটশাড়ীর ব্যবহার লক্ষ করা যায়। খুল্লনা বিবাহ কালে পট্টশাড়ী পরিধান করেছিল-

"বাছিয়া পরিল রামা দিব্য পট্ট শাড়ী। (দ্বিজ মাধব/১২৬)

ধনপতি খুল্লনাকে বিবাহ করার জন্য দিন নির্ণয়ের আগে প্রথমা স্ত্রী লহনাকে পাটশাড়ী ও গহনা দিয়ে সন্তুষ্ট করে ছিল—

"পরিতোষে লহনাকে দিয়া পাটশাড়ী।
পাঁচ পল সোনা দিল গড়িবারে চুড়ি॥" (মুকুন্দ/৯৮)[২৫]

খুল্লনাকে ছাগল চরাতে পাঠাবার সময় লহনা পাটশাড়ী খুলে নিয়ে খুঞার বসন পরিয়ে দিয়েছিল—

"খুঞা পরাইয়া পাটশাড়ী কৈল দূর" (ঐ/১১২)[২৬]

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে তসর নামে এক প্রকার বসনের উল্লেখ পাই সুশীলার বারমাস্যা বর্ণন অংশে—

"পৌষে তুলী পাতি তৈল তাম্বুল তপনে।

শীত নিবারণ দিব তসর বসনে॥" (মুকুন্দ/২২৫)[২৭]

আবার খুল্লনাকেও তসরের শাড়ী পরিধান করতে দেখি—

"খুল্লনার হাতে দিল আভরণ-পেড়ি।
দোছোটী করিয়া পরে তসরের সাড়ী॥ (ঐ/১২৩)[২৮]

কবিকঙ্কণের কাব্যে 'মেঘডম্বরু'কাপড়ের কথা পাই—

"বাছিয়া পরিল মেঘ-ডম্বরু কাপড়" (ঐ/১২৪)[২৯]

নারীরা বক্ষাবরণ হিসাবে কাঁচুলি পরিধান করত। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেবীর কাঁচুলি চিত্রন একটি বিশেষ প্রসঙ্গ। দেবী চণ্ডী ছদ্মবেশ ধারণের পূর্বে বিশ্বকর্মাকে দিয়ে কাঁচুলি নির্মাণ করিয়ে নেয়—

"পারি নানা আভরণে অবশেষে পড়ে মনে
হৃদয়ে কাঁচুলী আচ্ছাদন।
মনে করি ভগবতী কাঁচুলি নির্ম্মাণে মতি
বিশ্বকর্ম্মায় কৈলেন স্মরণ॥" (ঐ/৪৯) [৩০]

বাঙালী পুরুষের সাধারণ পোশাক হল ধুতি। বালক, যুবক নির্বিশেষে ধুতি পরিধান করত।কবিকঙ্কণের কাব্যে আমরা ভাঁড়ু দত্তকে ধুতি পরিহিত দেখি—

"ফোঁটা কাটা মহাদম্ভ ছিঁড়া ধুতি কোঁচা লম্ব
শ্রবণে কলম লম্বমান॥"(ঐ/৬৭)[৩১]

বিবাহ বা কোন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে ধুতি পরিধান করা বিধেয় ছিল। তাই শিবঠাকুরকে বিবাহকালে ধুতি পরিহিত দেখি, এমন কি নারীকেও ধুতি পরানো হত—

"পার্ব্বতী রূপবতী হরিদ্রাযুত ধূতি
পরিয়া বসিল আসনে।" ((ঐ/১৮)[৩২]

'গামছা' বাঙালীর একটি বহু ব্যবহৃত বস্ত্র। শুধু গা মোছার জন্য নয়, ধুতি পরিহিত বাঙালী পুরুষের কাঁধে গামছা শোভা পেতে দেখা যেত। মধ্যযুগের বাঙালী সমাজে গামছার ব্যবহার ছিল। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে গামছার ব্যবহার দেখা যায়-

"ভাঙ্গা কড়ি ছয় বুড়ি গামছা বান্ধিয়া।
ছাওয়ালের মাথায় বোঝা দিলেক তুলিয়া॥" (দ্বিজ মাধব/৭০)

এগুলি ছাড়াও পাগরী, ইজের ইত্যাদি পুরুষের পোশাক হিসাবে ব্যবহৃত হত। পাদুকা বা জুতার ব্যবহার প্রচলিত ছিল। সাধারণত ব্রাহ্মণরা খড়ম বা 'পানই' ব্যবহার করত। তবে চণ্ডীমঙ্গলে পাদুকা বা জুতা, খড়ম, মোজা ব্যবহারের কথা পাওয়া যায়। ধনপতি সদাগরের পাদুকা ব্যবহারের কথা পাই। যেমন—

"চরনে পাদুকা দিয়া করিল গমন।" (মুকুন্দ/৯৭)

কম্বল ব্যবহারের কথা পাওয়া যায় চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে। কম্বল শীত নিবারনের জন্য ব্যবহৃত হলেও কম্বলের আসন ব্যবহারের কথাও পাওয়া যায়। চণ্ডীমঙ্গলে আমরা দেখি রম্ভাবতী ধনপতিকে কম্বলের আসনে বসতে দিয়েছেন—

"বসাইল জামাতারে লোহিত কম্বলে।" (ঐ/১০০)[৩৩]

চণ্ডীমঙ্গলে পাই কালকেতু বন্যায় বিপর্যস্ত বুলান মণ্ডলকে কম্বল, অন্ন,বস্ত্র সাহায্য দিয়েছে—

"আইস বুলান ভাই ধর হে কম্বল।
যত চাহ দিব টাকা ভক্ষণ সম্বল॥" (ঐ/৬৭)

ধনীরা শয্যা নির্মাণের উপকরণ হিসাবে খাট, পালঙ্ক, মশারি ইত্যাদি ব্যবহার করত। দুর্বলার সজ্জা রচনার বর্ণনায়

আছে—

"ধবল চামর বান্ধা উপরে টাঙ্গায় চান্দা
প্রতি চালে মুকুতার ঝারা।
পাটের মশারি বেড় ভূমে নামে গজ দেড়
মাঝে মাঝে নানা পাট ডোরা॥ (ঐ/১২৮)[৩৪]

সমৃদ্ধির প্রকাশক হিসাবে ঐ উপকরণগুলি ব্যবহার করা হত। ধনপতির দ্বিতীয় বিবাহের কথা শুনে লহনা বলে তার সমৃদ্ধির সংসার অপরকে দিতে হবে। তাই তার আক্ষেপ—

"বহু ব্যয় করি কড়ি করিলাম খাট পিঁড়ি
সগল্লাদ নিহালী পামরী।
চন্দন কুসুম গুয়া কুঙ্কুম কস্তুরী চুয়া
কারে দিব মন্দির মশারি॥" (ঐ/৯৭)[৩৫]

'চান্দা' বা চাঁদোয়া এক প্রকার বস্ত্রখণ্ড। পূজা-পার্বণে উৎসবে খোলা জায়গায় 'চান্দা' টাঙ্গিয়ে তার নিচে উৎসবের আয়োজন করা হত—

"শুভবার্ত্তা পাইয়া হইয়া আনন্দিতা।
উঠানে টাঙ্গায় চান্দা আম্রশাখাযুতা॥" (ঐ/৯০)[৩৬]

অপেক্ষাকৃত দরিদ্রের জীবন ছিল দুঃখ কষ্টে ভরা, তারা সামান্য বস্ত্রে লজ্জা নিবারণ করত। মুকুন্দের কাব্যে কালকেতু-ফুল্লরাকে খুঁঞার বসন (গাছের বাকল নির্মিত) অর্থাৎ সামান্য বস্ত্র, ধড়া অর্থাৎ সামান্য কটিবাস পরিধান করতে দেখা যায়। এইসব বর্ণনায় দারিদ্র্যময় জীবনযাত্রার ছাপ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। তাছাড়াও অনার্য- ব্যাধ জাতির পোশাক-পরিচ্ছদের পরিচয়ও পাওয়া যায় চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে। কালকেতু শিকারযাত্রা ও যুদ্ধযাত্রার সময় সামান্য ধড়া পরিধান করে—

"প্রভাতে উঠিয়া বীর পরে রাঙ্গা ধড়া।"(ঐ/৪১)[৩৭]

কলিঙ্গরাজের সৈন্যরা যুদ্ধযাত্রাকালে ধড়া বা কটিবস্ত্র পরিধান করেছিল—

"পরিধান পীতধড়ী মাথায় জালের দড়ি
অঙ্গেতে লেপয়ে রাঙ্গা মাটি।"(ঐ/৭৫)[৩৮]

ফুল্লরা লজ্জা নিবারণের জন্য খুঁঞার বসন পরিধান করত। তার বারমাস্যা অনুযায়ী—

"পদ পোড়ে খরতর রবির কিরণ।
শিরে দিতে নাহি আঁটে খুঁয়ার বসন॥" (ঐ/৫৪)[৩৯]

সাধু-সন্ন্যাসীরা পশুর চামড়ার তৈরী পোশাক, আসন ইত্যাদি ব্যবহার করত, পায়ে খড়ম পরত। এ সমস্ত বর্ণনায় চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বাঙালীর নিজস্ব পোশাক-পরিচ্ছদের বিবরণ পাওয়া যায়।

পোশাক-পরিচ্ছদের পরেই আসে অলঙ্কারের কথা;. অলঙ্কারপ্রিয়তার মধ্যে দিয়ে বাঙালীর শখ-শৌখিনতার পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙালী রমণীরা অলঙ্কার প্রিয়। মধ্যযুগের কাব্যগুলিতে বাঙালী ব্যবহৃত বহু অলঙ্কারের পরিচয় পাওয়া যায়। এর মধ্যে দিয়ে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধানগত দিকটি যেমন ফুটে ওঠে তেমনি শিল্পবোধের পরিচয়ও পাওয়া যায়। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে প্রচুর অলঙ্কার ব্যবহারের কথা পাওয়া যাচ্ছে. যথা— হার. কুণ্ডল. অঙ্গুরীয়. মঞ্জীর. শঙ্খ. নূপুর. কঙ্কণ. পাসুলী. বউলি. পলা. রুলি. চুড়ি. তার. মল ইত্যাদি। মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেখি ধনপতি বিবাহে কারিগরকে দিয়ে বিভিন্ন প্রকার অলঙ্কার তৈরী করিয়ে নিয়েছে—

"অলঙ্কার গড়ে বাণিয়া সাধুর কুমার

উচল পিড়াতে বসিল কারিগর॥
উপর কানের চাকি গড়ে নাস্ত কর্নের কড়ি।
বাঁকমল গড়িয়া গড়ে পায়ের পাছলি॥
গলার গণিয়া গড়ে শতেশ্বরী হার।
দুই বাহায় গড়িল জাম্ফল দুই তার॥
উঝটিয়ান গড়ে লেখা নাই তারে।
নাসার বেশর পড়ে ঝলমল করে॥
রত্নের য়ঙ্গুরি সব গড়িল থরে২।
নানাজাতি অলঙ্কার গড়িল তাহারে॥
দুই হস্তের শঙ্খ গড়ে শ্রীরামলক্ষণ।
শঙ্খের মুখেতে শোভে মানিক কঙ্কন॥
মানিক গজরাজ গড়ে করে ঝলমল।
নানাবর্ণ চিত্র কৈল অতি মনোহর॥" (মানিক/২০৫)

দ্বিজ মাধবের কাব্যে আমরা 'খুল্লনার বিবাহসজ্জা' অংশে নানা ধরনের অলঙ্কারের পরিচয় পাই—

"শ্রুতিমূলে শোভা করে রত্নকুণ্ডল।
অরুণ সমান যার জ্যোতি ঝলমল॥
মণিময় মুক্তা শোভে নাসিকা উপর।
কণ্ঠে কণ্ঠমণি হার অতি মনোহর॥
করপল্লবে শোভে রত্ন-অঙ্গুঠি।
অলক্ষিতে পুষ্প যেন ফুটে গাঠি গাঠি॥
মঞ্জু মঞ্জীর দুই পদ করে শোভা।
পদ-অঙ্গুলে শোভে রজতের আভা॥
বাহুযুগে তার শোভে বিচিত্র নির্ম্মাণ।
লাবণ্য প্রবাল শঙ্খ কৈল পরিধান॥" (দ্বিজ মাধব/১২৫-১২৬)

বিভিন্ন মণি, মুক্তা, প্রবাল ইত্যাদি মূল্যবান পাথর গহনাতে ব্যবহার করা হত—

"পীত তড়িত বর্ণে হেম-কুণ্ডলিকা কর্ণে
কেয়-মেঘে পড়িছে বিজুলী
রতন পাশুলি ছটি পরে দিব্য তুলাকোটি
বাহু-বিভূষণ ঝলমলী॥
পরে দিব্য পাটশাড়ী কনকের পরে চুড়ী
দুই করে কুলুপিয়া শঙ্খ।
হীরা নীলা মতি পলা কলধৌত-কণ্ঠমালা
কলেবরে মলয়জ-পঙ্ক॥" (মুকুন্দ/১২৯)[৪০]

বিবাহকালে কনেকে নানা রকম মূল্যবাণ গহনা উপহার দেওয়া হত। চণ্ডীমঙ্গলে দেবী চণ্ডী কালকেতুকে সাত ঘড়া মোহর ও একটি সুবর্ণ অঙ্গুরীয় উপহার দিয়েছিল —

"বীরহস্তে দিলা চণ্ডী মাণিক্য অঙ্গুরী। (ঐ/৫৭)[৪১]

শুধু নারী নয়, পুরুষরাও মধ্যযুগে কিছু কিছু অলঙ্কার ব্যবহার করত। শিবের বিবাহে শিবঠাকুর মদনমোহন রূপ ধারণ করলে তার কণ্ঠের অস্থিমালা রত্নহারে পরিণত হয়—

"অস্থিমালা ছিল যত হইল রত্নমাল।" (ঐ/১৯)[৪২]

মনে হয় মধ্যযুগেই পুরুষের গহনা পরিধান করার প্রবণতা হ্রাস পেয়েছিল। তবে নিম্নশ্রেণীর অনার্য পুরুষরা কানে কুণ্ডল, হাতে তারবালা পরিধান করত তাই কালকেতুকে অলঙ্কার পরিধান করতে দেখা যাচ্ছে—

"দুই চক্ষু জিনি নাটা খেলে দাণ্ডাগুলি ভাঁটা
কানে শোভে স্ফটিক-কুণ্ডল॥" (ঐ/৩৬)[৪৩]

রূপচর্চার জন্য বিভিন্ন প্রকার প্রসাধন দ্রব্য ব্যবহারের কথা পাই চণ্ডীমঙ্গলে, যথা— তেল, আমলকি, হরিদ্রা, চন্দন, চুয়া, কুমকুম, সিন্দুর, কাজল, অগুরু, বিভিন্ন প্রকার গন্ধদ্রব্য ইত্যাদি।রূপচর্চার সহায়ক ব্যবহার্য উপাদান হল চিরুণী ও দর্পণ। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দর্পণ ও চিরুণী ইত্যাদির দ্বারা রূপচর্চার কথা পাওয়া যায়—

"গৃহে থাকি সুশীলা করিছে নানা বেষ।
বান্ধিল বিচিত্র খোপা আচুড়িয়া কেশ॥
কেশ বান্ধি বেষ কৈল পহিলেক শাড়ী।" (মানিক/৩৫৭)

কবিকঙ্কণের কাব্যে চিরুণী ও দর্পণ সহযোগে প্রসাধন করার কথা পাই—

"দুর্ব্বলা মাজয়ে কেশ লয়ে প্রসাধনী।
বাম করে হেম-দণ্ড রসাল দর্পণী॥
আঁচড়িল কেশ তার নানা পরিবন্ধে।
গন্ধতৈলযুত হয়ে পরে তার স্কন্ধে॥
কবরী বান্ধিল রামা নামে শুয়া-ঠাঁটি।
দর্পণে নেহালে রামা যেন গুয়া গুটি॥
মেছেতা দেখিয়া মারে দর্পণে চাপড়।
বাছিয়া পড়িল মেঘ-ডম্বরু কাপড়॥ (মুকুন্দ/১২৪)[৪৪]

কাজল বা কজ্জল একটি উত্তম প্রসাধনী। নারীরা চোখের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য কাজল ব্যবহার করত-

"নয়ানে কজ্জ্বল পহ্রে বেশর নাসাতে।" (মানিক/৩৫৭)

বিবাহিত নারীরা হাতে শঙ্খ বা শাঁখা এবং কপালে সিন্দুর পরত। হিন্দুর রীতি অনুযায়ী মঙ্গলকাব্যে এয়োস্ত্রীগণের শাঁখা-সিন্দুর ব্যবহারের প্রসঙ্গ পাই। যথা—

"কপালে সিন্দুর পহ্রে কর্ন্নে পহ্রে কড়ি।
. . . . . .
গলে হার বাহে তার শঙ্খ পহ্রে হাতে॥" (মানিক/৩৫৭)

মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যেও এয়োস্ত্রীগণের সিন্দুর ব্যবহারের কথা পাই—

"যতনে পরয়ে রামা কজ্জ্বল সিন্দূর।
মার্জ্জনা করিয়া পরে মণিকর্ণপুর।" (মুকুন্দ/১২৪)[৪৫]

হরিদ্রা, কুমকুম, চন্দন, চুয়া ইত্যাদি প্রসাধনী দ্বারা রূপচর্চা করা হত এবং গায়ের ময়লা দূর করা হত-

"হরিদ্র কুঙ্কুম লয়ে ঘরে ঘরে ভ্রমি চেয়ে
করিতে অঙ্গের মলা দূর।" (ঐ/১২৫)[৪৬]

কিংবা–

"হরিদ্রা কুঙ্কুম তৈল আনিলা দুর্ব্বলা।
খুল্লনার অঙ্গে দিয়ে দুর কৈল মলা॥
আমলকী দিয়া কৈল কেশের মার্জ্জন।
স্নান করি পরাইল উত্তম বসন॥" (ঐ/১২০)[৪৭]

মৃগমদ, কুঙ্কুম, চন্দনের দ্বারা সুসজ্জিত করে তোলা হত, যেমন—

"দুর্ব্বলা বুঝিয়া কাজ আনিল বেশের সাজ
মৃগমদ কুঙ্কুম চন্দন॥" (ঐ/১২৮)[৪৮]

কেশ প্রসাধনের জন্য 'নারায়ণ তৈল' নামে এক প্রকার সুগন্ধি তেল ব্যবহারের কথা পাই অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে আমলা তেল ব্যবহারের কথা পাওয়া যায়—

"করে লয়ে আমলা সুগন্ধি তৈলবাটি।
সাধুর নিকটে যেয়ে কহে পরিপাটী।" (ঐ/২২৫)[৪৯]

বিবাহাদি অনুষ্ঠানে বর-কনেকে চন্দন দ্বারা সুসজ্জিত করা হত—

"তৈল কুড় দিল বরের কপালে চন্দন। (মানিক/৩৫৭)

চুয়া, চন্দন, কস্তুরী ইত্যাদি গন্ধদ্রব্য হিসাবেও ব্যবহার করা হত। বঙ্গনারীগণ নানা ছাঁদে কবরী বা খোপা বাঁধতে পারত, তারা খোপায় পুষ্পহার দিয়ে নিজেকে আকর্ষণীয় করে তুলত। মুকুন্দ চক্রবর্তী 'শুয়াঠুটি' খোপার উল্লেখ করেছেন। লক্ষণীয় বিষয় যে, মঙ্গলকাব্যে এই সমস্ত আয়োজনই কিন্তু বিত্তবানদের জন্য। সাধারণ মানুষের জীবন ছিল প্রায় নিরানন্দময়। প্রসাধন দ্রব্য ব্যবহারের ক্ষমতা তাদের ছিল না, তাই কালকেতুর ফুল্লরার বিবাহে কোন রকম প্রসাধন ব্যবহারের কথা নেই, তাদের বিবাহে ব্যবহৃত বস্ত্র, অলঙ্কার ও প্রসাধন যৎসামান্য । অনার্য-ব্যাধ সমাজেও হিন্দুরীতি অনুযায়ী সিন্দুর ব্যবহারের কথা আছে। সিন্দুর পরিধান রীতি সম্ভবত অনার্য সমাজ থেকেই আর্য সমাজ গ্রহণ করেছিল। কালকেতুর বিবাহে কবি বর্ণনা অনুসারে—

"পাঁচ গণ্ডার কিনিলেক দুইগাছি ধড়া।
একখানি খইয়া লইল দিয়া পাঁচ কড়া॥
দশ কড়ার খড় কিনি হরিষ প্রচুর।
পাঁচ কড়ার কিনিলেক মাটিয়া সিন্দূর॥ (দ্বিজ মাধব/৩৮)

বাদ্যযন্ত্র ঃ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বাঙালীর সামাজিক ইতিহাসের আর একটি উপকরণ হল বিভিন্ন প্রকার বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার। চণ্ডীমঙ্গলে চামড়া দ্বারা আচ্ছাদিত বাদ্যযন্ত্র, ধাতু নির্মিত বাদ্যযন্ত্র, তারের বাদ্যযন্ত্র, ছিদ্রযুক্ত বাদ্যযন্ত্র সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্রের কথাই আছে, যেমন—মৃদঙ্গ, জগঝম্প, ডম্বরু, যোড়া, দামা, পড়া, ডিণ্ডিম, ডম্ফ, জয়ঢাক, দ্গাড়, ভেড়ি, পখোয়াজ, জোড়া, দুন্দুভি, ঢাক, ঢোল, রায়বাশ, বাঁশী, ভেউর, কারনাল, তাম্বুর, রণকাড়া, কাড়া, খোল, করতাল, খঞ্জরি, দোতারা, ঘাগর, ঘুঘুরা, সারিন্দা, বেণু, রবাব, সপ্তস্বরা, পিনাকিণী, বল্লকী, খমক, শঙ্খ, শিঙ্গা, মহুরী, সানাই, তুরি, কাঁসর, ঘন্টা, মন্দিরা, বেণী, দোখণ্ডী, ঠনক, মঙ্গল ইত্যাদি। বিবাহ, পূজা-পার্বণ ও বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রকার বাদ্যযন্ত্র বাজানো হত। তাছাড়াও যুদ্ধযাত্রাকালেও এক ধরনের রণবাদ্য বাজানো হত। মানিক দত্তের কাব্যে খুল্লনার বিবাহে নানা প্রকার বাদ্যযন্ত্রের আয়োজন দেখি—

"দুন্দবি বাদ্যের রোল বাজে ঘনে ঘন॥
ভেউর করনাল বাজে আর বাজে কাড়া।
কাঁসি বাঁশি বাদ্য বাজে মৃদঙ্গ দ্গাড়া॥" (মানিক/২০৯)

দ্বিজ মাধবের কাব্যে ধনপতির বিবাহে যে সমস্ত বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয়েছিল সেগুলি হল—

"মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে মঙ্গল-নিশান।
ভেউর ঝাঁঝরি বাজে অনেক সন্ধান॥
ঢাকরিয়া ঢাক বায়ে সানাই করতাল।
নানাবিধ বাদ্য বাজে শুনিতে রসাল॥" (দ্বিজ মাধব/১২৭)

মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্য সর্বাপেক্ষা তথ্যবহুল কাব্য। এখানে প্রচুর বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার লক্ষ করি। কবিকঙ্কণের কাব্যে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রসমূহের বিবরণ নিম্নরূপ—

১। ভেরী তূরী বাজে ভাল কাংস্যবাদ্য করতাল
পটহ মুন্দুভি বাজে বীণে॥
রামা দেয় জয়ধ্বনি সপ্তস্বরা পিনাকিনী
বাজে নানা মঙ্গল-বাজন॥" (মুকুন্দ/৪)

২। "বরযাত্রী পড়ে পাড়া ঢেমছা দ্গাড় কাডা
বর বেড়ি বাজায় বাজন॥
কালকেতুর বিবাহ-মঙ্গল॥" (ঐ/৩৮)[৫০]

৩। দেখিলাম অপরূপ সুগন্ধি অগুরু ধূপ
সায়ংকালে ব্যাল্লিশ বাজন॥
প্রতি ঘরে সন্ধ্যাকালে মণিময় দীপ জ্বলে
শঙ্খ ঘন্টা বাজে বীণা বেণী।
কাঁসর মহুরি পড়া জগঝম্প বাজে কাড়া
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে সানি॥" (ঐ/৭৫)[৫১]

৪। তাথিনি তাথিনি থিনিমৃদঙ্গ মন্দিরা ধ্বনি
ঘন বাজে তরন কঙ্কণ॥
হয়ে মুনি সাবহিত নারদ গায়েন গীত
বীণা-গুণে তরল অঙ্গুলি ।
ডিমি ডিমি ডম্বরু বায় ডমকের বাজনা তায়
নারদ পিনাকী কুতূহলী॥" (ঐ/৯১)[৫২]

৫। পটহ মৃদঙ্গ সানি দ্গাড় কাঁসর বেণী
শঙ্খ বাজে দোখণ্ডী বিল্লকী।
খমক টমক ভেরী জগঝম্প বাজে তুরী
অঙ্গভঙ্গে নাচয়ে নর্ত্তকী॥" (ঐ/৯৯)[৫৩]

আবার কতকগুলি রণবাদ্য হিসাবে, যুদ্ধ যাত্রাকালে বাজানো হয়েছে, যেমন—

১। চৌদিকে ধাঁ ধাঁ বাজয়ে দামামা
তবকী তবকে বোল।
পাই দেয় উড়া পাক ঘন বাজে জয়ঢাক
কারো কেহ নাহি শুনে বোল॥
ডিম ডিম ডম্বর পূরয়ে অম্বর
নানা শব্দে বাজে জগঝম্প।

বাজয়ে সানি রণজয় বেণী

গুজরাটে উঠিল কম্প॥" (ঐ/৭৭)[৪৪]

২। সাজ সাজ বলি দামামায় পড়ে ঘা॥

.. ..

রামবীণা গন্ধবীণা বাজে রুদ্রবীণা।

দগড় দোগড়ী বায় শত শত জনা॥

হস্তীর গলায় ঘন্টা শুনি ঠনঠনি।

কাংস্য করতাল বাজে বিপরীত শুনি॥

জয়ঢাক বীরঢাক রাজসী বাজনা।

প্রলয় সমর যেন পড়ে ঝনঝনা॥"(ঐ/২০৯)[৪৫]

শিল্পকর্ম ঃ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে মানুষের সৌন্দর্য ও শিল্পবোধের পরিচয় আছে। বাংলার লৌকিক জীবনে ব্যবহৃত নানান উপকরণের মধ্যে দিয়ে বাঙালীর শিল্পবোধের পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে, তা যেমন একদিকে মানুষের সৌন্দর্যবোধের পরিচায়ক, তেমনি মানুষের অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণেও সাহায্য করেছে, যেমন— বাঁশ ও বেতের কাজ, সূচীশিল্প, রং-তুলির কাজ বা চিত্রকলা, গহনা শিল্প, মৃৎশিল্প, আলপনা অঙ্কন ইত্যাদি। দেবীর কাঁচুলি নির্মাণের মধ্যে দিয়ে মধ্যযুগের বস্ত্রশিল্প ও চিত্রকলা শিল্পের কথা জানা যায়। মানিক দত্তের কাব্যে চণ্ডীর কাঁচুলি নির্মাণ প্রসঙ্গ আছে—

"বস্ত্র চিরিয়া তবে কৈল খান খান।

দেব কাচুলী তার করেন নির্মান॥

চিত্র বিচিত্র করে কাচুলী নির্মান।

দেখি সুছন্দ অতি দেব মোহজান। (মানিক/৮৩)

দ্বিজ মাধবের কাব্যেও দেবীর কাঁচুলি চিত্রন কথা আছে—

"অলঙ্কারে পূর্ণ বেশ হইলা মহামায়ে।

কঞ্চুলী নির্ম্মাইতে দেবী বিশাইরে আনায়ে॥

দেবী বোলে বিশ্বকর্ম্মা বলিরে তোহ্মারে।

বিচিত্র কঞ্চুলী নিম্মাই দেয়ত আমারে॥

. . . . . .

সে কাঞ্চুলী দিয়া অঙ্গে বসিলা ভবানী

বিশাই চলিল তবে করিয়া মেলানি॥" (দ্বিজ মাধব/৪৯-৫০)

কবিকঙ্কণের কাব্যেও কাঁচুলি চিত্রন প্রসঙ্গ আছে, সেখানে শুধু কাপড় কেটে কাঁচুলি নির্মাণের কথাই নেই, এতে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও শাস্ত্রের বিভিন্ন কাহিনী চিত্রিত করা হয়েছে। এর মধ্যে দিয়ে বাংলার চিত্রশিল্প ও সূচীশিল্পের পরিচয় পাওয়া যায়।

গহনা শিল্প বাংলার অন্যতম শিল্প। মূল্যবান পাথর ও ধাতু নির্মিত গহনার পরিচয় জানা যায় চণ্ডীমঙ্গলে। অলঙ্কারের উপর নানা কারুকার্য করা হত. এতে বাঙালী অলঙ্করণ শিল্পীর দক্ষতার পরিচয় আছে। বাঙালী রমণীগণ সুন্দর আলপনা আঁকতে পারত। তারা উৎসব অনুষ্ঠানে, বিবাহকালে মেঝেতে, পিঁড়িতে সুন্দর আলপনা আঁকত। কালকেতুর বিবাহে আলপনা অঙ্কনের কথা পাই—

"গোময়ে লেপিয়া মাটি আলিপনা পরিপাটি

চতুর্দ্দিকে বান্ধবের মেলা॥" (মুকুন্দ/৩৮)[৫৬]

গ্রামীণ বাঙালী নারীপুরুষ বাঁশ ও বেতের কাজ, শোলার কাজ করত। রূপচর্চা বা প্রসাধনে বাঙালীর শিল্পবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। রন্ধনকার্যেও বাঙালীর শিল্পবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। বস্ত্রশিল্পেও বাঙালীর উৎকর্ষতার পরিচয় আছে, তাঁত, তসর প্রভৃতি উন্নতমানের বস্ত্র নির্মাণের কথা আছে চণ্ডীমঙ্গলে—

"পাইয়া ইনাম বাড়ী বুনে নেত পাট শাড়ি
দেখি বড় বীরের হরিষ।"(ঐ/৭১)[৫৭]

শঙ্খবেণেরা শাঁখা তৈরী করত, কাঁসারি বাসনপত্র নির্মাণ করত—

"শঙ্খবেণে কাটে শঙ্খ কেহ করে নবরঙ্গ
মণিবেণে বসে গুজরাটে।
কাঁসারি পতিয়া শাল গড়ে ঝারি খুরি থাল
ঘটি বাটি বড় হাঁড়ি সীপ॥
ডাবর চুনাতি বাটা সাপড়া ঘাঘর ঘন্টা
সিংহাসনে গড়ে পঞ্চদীপ॥" (ঐ)[৫৮]

দর্জিরা কাপড় সেলাই করত—

"দরজী কাপড় সিঁয়ে বেতন করিয়া জীয়ে
গুজরাটে বসে এক পাশ।" (ঐ)[৫৯]

বাংলার মৃৎশিল্প উন্নত ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় চণ্ডীমঙ্গলে—

"কুম্ভকার গুজরাটে হাঁড়ি-কুঁড়ি গড়ে পিটে
মৃদঙ্গ দ্গার কাড়া পড়া।
শত শত একজায় গুজরাটে তন্তুবায়
ভুনি ধূতি বোনে জোড় গড়া॥" (ঐ)[৬০]

এই সমস্ত শিল্পকর্মে বাঙালীর দক্ষতা ছিল, যা তাদের জীবিকায় সহায়ক হত।

যানবাহন ঃ অতঃপর আসি যানবাহনের কথায়। ষোড়শ শতাব্দীতে যানবাহন ব্যবস্থা উন্নত ছিল না। লোকে সাধারণত পায়ে হেঁটেই যাতায়াত ও মাল পরিবহণ করত। পশুর পিঠে চড়ে যাতায়াত ও মাল পরিবহণ করা আদিম ব্যবস্থা , মধ্যযুগ পর্যন্ত এ ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল। হাতি, ঘোড়া, গাধার পিঠে চড়ে যাতায়াত করা হত। আধুনিক কাল পর্যন্ত এ সমস্ত পশুই বাহন হিসাবে ব্যবহৃত হত। মধ্যযুগের যানবাহনগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে— স্থলযান ও জলযান। স্থলযান হিসাবে ব্যবহৃত হত গরু বা ঘোড়ার গাড়ী, দোলা. চতুর্দোল, পালকী, রথ ইত্যাদি, আর জলযান হিসেবে ব্যবহৃত হত নৌকা, ভেলা ইত্যাদি। চণ্ডীমঙ্গলে দোলা বা পালকীর ব্যবহার সব চাইতে বেশী দেখা যায়। দ্বিজ মাধবের কাব্যে দেখা যায় সাধারণ মানুষ দোলায় চড়ে চলাফেরা করছে। আবার রাজপুরুষরাও দোলা ব্যবহার করত। তাছাড়া হাতি, ঘোড়া চলাফেরার কাজে ব্যবহার করা হত। কালকেতু গ্রামের মণ্ডলকে যাতায়াতের জন্য হাতি ও দোলা উপহার দিয়েছে-

"দোল ঘোড়া দিল বীর মণ্ডলের তরে।" (দ্বিজ মাধব/৬৪)

রাজা-মহারাজা, রাজপুরুষরা হাতি ঘোড়ার পিঠে যাতায়াত করত, যেমন—

"কংস-নদীর তটে রাজা দিল দরশন।
হস্তী হইতে নামি রাজা ভূমিতে গমন॥" (ঐ/২৬)

ধনপতির বিবাহে বরযাত্রী সহ বর সুসজ্জিত দোলায় চড়ে যাত্রা করেছিল—

"খরোয়ারে বোলে দোলা কর রে সাজন।
সাধুর দোলায়ে সাজে খারুয়া ষোলজন॥
. . . . . .
দোলা লইয়া আইল খারু সাধুর গোচর।
নিজ পরিচ্ছদে দোলায়ে উঠে সদাগর॥" (ঐ/১২৬)

নারীরাও দোলায় বা চতুর্দোলে যাতায়াত করত। খুল্লনাকে বিবাহের সময় চতুর্দোলায় বের করা হয়েছিল—

"ধনপতি রহে গিয়া চান্দোয়ার তলে।
খুলনা বাহির কৈল করি চতুর্দ্দোলে॥" (ঐ/১২৯)

মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যে দোলার ব্যবহারই সব চাইতে বেশী, এখানেও আছে ধনপতি দোলায় চেপে বিবাহ করতে যাচ্ছে। তাছাড়া ধনী ব্যক্তিরা চলাফেরার কাজে দোলা ব্যবহার করত—

কিঙ্করে করিয়া দিল দোলার সাজন।
দোলায় চাপিয়া চলে বেণের নন্দন॥"(মুকুন্দ/১০১)[৬১]

যানবাহন হিসাবে ঘোড়ায় টানা গাড়ী বা রথ ব্যবহার করত ধনী ব্যক্তিরা—

"বায়ুবেগে রথ ধায় উর্দ্ধমুখে সবে চায়
পুষ্পকেতু উভরায় কান্দে।
. . . . . .
যায় বীর দিব্য-রথে মাতলি সারথি সাথে
জিজ্ঞাসেন মায়ের বারতা॥" (ঐ/৮৯)[৬২]

মালপত্র পরিবহণের কাজে হাতি, ঘোড়া, গাধা ব্যবহার করা হলেও সাধারণ মানুষ যেমন পায়ে হেঁটে যাতায়াত করত তেমনি মালপত্র ভারীরা ভারে করে বহন করত । ধনপতির বিবাহে প্রেরিত মালপত্র ভারীরা ভারে করে বহন করেছিল এমন তথ্য পাওয়া যায়—

"লয়ে বিবাহের সাজ চলিল ঘটকরাজ
কুলীন পণ্ডিত পুরোহিত।
আগু পাছে সারি সারি সজ্জা লয়ে যায় ভারী
গায়নে মঙ্গল গায় গীত॥" (ঐ/৯৯)[৬৩]

জলযান হিসাবে নৌকার ব্যবহার অতি প্রাচীন। মঙ্গলকাব্যে জলযান নৌকার ব্যবহারের কথা পাওয়া যায়। বস্তুতপক্ষে মধ্যযুগে যোগাযোগ, মালপত্র পরিবহণ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে নৌকা-ই ব্যবহার করা হত। নদীমাতৃক বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা নির্ভর করেছিল জলপথের উপর। প্রাচীন বণিকগণ দূরবর্তী স্থানে বাণিজ্য করতে যেত সওদাগরি নৌকায়। চণ্ডীমঙ্গলে ধনপতি ও শ্রীমন্তের নৌবাণিজ্যের কাহিনী আছে। যেমন মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যে শ্রীমন্তের বাণিজ্যযাত্রার কিছু অংশ—

"প্রথমে তুলিল ডিঙ্গা নাম মধুকর।
সুবর্ণে নির্ম্মাণ সে ডিঙ্গার ছৈঘর॥
. . . . . .
সাত খান ডিঙ্গা ভাসে ভ্রমরার জলে
গোঁজে বান্ধি রাখে ডিঙ্গা লোহার শিকলে॥" (ঐ/১৫২)[৬৪]

গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থায় জলপথে 'ভেলা' বা 'ভুরা' ব্যবহার হত। বন্যার সময় পথঘাট জলে ডুবে গেলে লোকে

যোগাযোগের জন্য 'ভুরা' বা 'ভেলা' ব্যবহার করত। কলিঙ্গ রাজ্যে বন্যা হলে ভাঁড়ু দত্ত সপরিবারে ভেলায় আশ্রয় নিয়েছিল—

"সগোষ্ঠি সহিতে ভাড়ু ভেলাতে চড়িল।
ভেলাতে চড়িয়া ভাড়ু চলিতে লাগিল॥" (মানিক /১৩১)

মধ্যযুগে আকাশ পথ ব্যবহার সম্ভব ছিল না। তবে দেব দেবীগণ অলৌকিক সুদিব্য বিমানে আকাশ পথে চলাফেরা করত এটা কবি কল্পনা মাত্র, ঐতিহাসিক সত্য নয়।

সংস্কার ও বিশ্বাস-কেন্দ্রিক উপাদান ঃ অতঃপর আসি চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বর্ণিত সংস্কার-বিশ্বাস, আচার-আচরণ বা অনুষ্ঠান-কেন্দ্রিক উপাদানের কথায়। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কবিগণ কিন্তু অনার্য নন, তারা অধিকাংশই উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। চণ্ডীমঙ্গলের কবিগণ আপন আপন সমাজ অভিজ্ঞতা অনুসারে তাদের নিজস্ব সামাজিক আচার-বিচার, সংস্কার-বিশ্বাসকে বর্ণনা করেছেন। বাঙালী চিরকালই দৈববাদী ও অদৃষ্টবাদী; ঝাঁড়ফুক, তুক্‌তাক, মারণ-উচাটন-বশীকরণ, হাঁচি টিক্‌টিকির বাঁধন এসবের প্রতি এক জাতীয় বিশ্বাস ছিল। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাই বাঙালীর জীবন নানান সংস্কার ও বিধিনিষেধে আবদ্ধ ছিল। অদৃষ্টবাদী ইহজীবন বিমুখ বাঙালীর সাহিত্য তাই দেবাশ্রয়ী । ক্রমাগত বিপর্যয়ে সেদিন বাঙালী আত্মশক্তিহীন হয়ে পড়েছিল বলেই অদৃষ্টের বন্ধনকে অমোঘ বলে স্বীকার করে নিয়েছিল। চণ্ডীমঙ্গলে বাঙালীর এই জীবন সত্যটি স্বীকৃত হয়েছে। গ্রহ, নক্ষত্র, তিথি, বার-ব্রত, বিভিন্ন ধরনের অতিলৌকিক ক্ষমতা, মিথ, কর্মবাদ ইত্যাদির প্রতি বাঙালীর এক জাতীয় বিশ্বাস ছিল। তাইতো অনার্য-ব্যাধ কালকেতুর মুখেও শোনা যায় দৈববাদের কথা। দ্বিজ মাধবের কাব্যে অনার্য বাঙালীর হাহাকার শুনি-

—

"সব ব্যর্থ হইল মোর পাপ কর্ম্মফলে।" (দ্বিজ মাধব/৪৭)

মুকুন্দ চক্রবর্তীর কালকেতুর খেদোক্তি—

"সুকৃতি-পুরুষ জীয়ে সুখ-ভোগ হেতু।
দুঃখ-ভোগ করিবারে জীয়ে কালকেতু॥"(মুকুন্দ/৪৭)[৬৫]

কিংবা ফুল্লরার মত রমণীর কন্ঠে শুনি দৈব-পরিহাসের কথা—

"দারুণ দৈবের গতি কপালে দরিদ্র পতি
পড়িনু সঙ্কল-চিন্তা-ফাঁদে॥ (ঐ/৪৮)[৬৬]

গ্রহ, নক্ষত্র, তিথি, বার মানব জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করেছে, এগুলি যেমন শুভ ফলদায়ক, তেমনি আবার অশুভও । গোধূলি লগ্ন বা 'ভদ্রাকালে' যাত্রা অমঙ্গল, তাই পঞ্জিকা দেখে শুভলগ্ন বিচার করে যাত্রা করা হত। ধনপতির বাণিজ্য যাত্রাকালে শুভলগ্ন অতিক্রম করেছিল—

"জাত্রার লগন ভাল সেহ বহিআ গেল।
ভদ্রাকালে ধনপতি জাত্রা করিল॥" (মানিক/২৬৫)

দ্বিজ রামদেবের কাব্যেও তিথি, মাস বিচার করে যাত্রালগ্ন নির্ধারণ করা হয়েছে—

"না যাইঅ সিংহলে সাধু বাক্য শুন মোর।
পঞ্চম মঙ্গল সাধু গণিলুম তোর॥
সর্ব্বদাএ সিংহলে পাইবা অপযশ।
জন্মস্থ হইল গুরু ভানু যে দ্বাদশ॥
. . . . . .
তিথি বার দগ্ধা আর মাস দগ্ধা হয়।

আজুকা গমনে সাধু জীবন সংশয়।."(দ্বিজ রামদেব/২৬৬-২৬৭)

খুল্লনার গর্ভসঞ্চারের পূর্বে গ্রহ-নক্ষত্র বিচার করে শুভলগ্ন নির্ধারণ করা হয়েছে—

"খুল্লনার স্বয়ম্ভু-কুসুম পরকাশ॥
রবিবার মৃগশিরা তিথি ত্রয়োদশী।
শুভলগ্ন শুভযোগ শুভস্থানে শশী॥" (মুকুন্দ/১৩৬)

কিংবা, শ্রীমন্তের বাণিজ্য যাত্রাকালে শুভ তিথি হল—

"শুভযোগ মৃগশিরা মেরুশৃঙ্গে যেন হীরা
ভাগ্যযোগে তাহে রবিবার।
বণিজ দশমী তিথি বাণিজ্য করণ ইথি।
ইহা বিনা যাত্রা নাহি আর॥" (ঐ/১৭৭)[৬৭]

শ্রীমন্তের জন্মলগ্নে গ্রহ, নক্ষত্র, তিথি, রাশি অনুযায়ী সমস্ত অবস্থান শুভ ছিল—

"মকরে ধরণী-সুত বৃষে চাঁদ গুরুযুত
মেষে লিখে প্রচণ্ড-কিরণে।
তুঙ্গ ঘরে বৈসে রাহুসূচয়ে কল্যাণ বহু
বুধ লিখে গুরুর ভবনে॥
চাপ লগ্নে শনৈশ্চর তুলা রাশে ভৃগুবর
মঙ্গল সূচন করে কেতু।
শুভ যোগ কাল দণ্ড ইথে জাত নহে ছণ্ড
পিতার উদ্ধারে হবে হেতু॥"(ঐ/১৬৭-১৬৮)[৬৮]

এছাড়া ছিল পশুপাখি-কেন্দ্রিক সংস্কার, সময় বিশেষে বিভিন্ন পশুপাখির আচরণ কখনো শুভ আবার কখনো অশুভ বলে বিবেচিত হত।যাত্রাকালে পেঁচার ডাক শোনা, শুকুনি-গৃধিনী উড়ে যাওয়া, টিকটিকি ডাকা এবং গায়ে পড়া অশুভকর চিহ্ন। ধনপতি বাণিজ্য যাত্রাকালে এই সমস্ত অশুভ লক্ষণ দেখেছিল—

"জাত্রা করি ধনপতি রহিল পুরের বাহিরে।
মোসানীতে ঠুটা বানর নাচায়ে॥
আকাশতে সর্ব্ব কয়ে মার কাট।
সম্মুখে গৃধিনী পাখার মারে সাট॥
বামে সর্প দেখিল সাধু ডাহিনে জাম্বকি।
জাত্রাকালে য়মঙ্গল দেখি মনে হৈল দুখি॥"(মানিক/২৬৫)

বাদিয়ার বানর নাচানো দেখা, যোগিনীর ভিক্ষা করা দেখা, বামে কালসাপ , ডানে শৃগাল পথ অতিক্রম করা, তেলীর তেল বিক্রয় দেখাও অমঙ্গল সূচক—

"যাত্রা করি বাহির হইতে সদাগর।
মধ্য নগরে বাদিয়া নাচায়ে বানর॥
তাহারে দেখিয়া সাধু চলয়ে তৎকাল।
যোগিনী মাগয়ে ভিক্ষা করে লইয়া থাল॥
তাহাকে দেখিয়া যাত্রা না করিল ভঙ্গ।
পন্থে যাইতে দেখে বামে কাল-ভুজঙ্গ॥

বাম দিক হোতে শিবা দক্ষিণে সে যায়ে।
তৈল লৈবা লৈবা তেলীয়ে বোলায়ে॥
খুলনায়ে বোলে প্রভু শুনহ বচন।
এত অমঙ্গল দেখি না যাও পাটন॥" (দ্বিজ মাধব/২০১)

পায়ে হোঁচট লাগা, মাথায় ডোমচিল ওড়া, কাপড়ে সেয়াকুল কাঁটা লাগা, কাঠুরের মাথায় কাঠের ভার দেখা, শুকনো ডালে কোকিল ডাকা, জেলের হাতে কচ্ছপ দেখা যাত্রাকালে অমঙ্গল সূচক—

"পথে যাইতে সদাগর লাগিল উচোটা।
নেতের আঁচলে লাগে সেয়াঁকুল কাঁটা॥
যাত্রার সময় ডোমচিল উড়ে মাথে।
কাঠুরে কাঠের ভার লয়ে যায় পথে॥
শুকানো ডালেতে বসি কু-বোলয় কাউ।
যোগিনী মাগয়ে ভিক্ষা আধখানি লাউ॥
কচ্ছপ লইয়া পথে ধীবর চলি যায়।
তৈল লবে তৈল লবে তেলীরা বেড়ায়॥
চলিলেক সদাগর মনে কুঁতূহলী।
বাম দিকে ভুজঙ্গম দক্ষিণে শৃগালী॥" (মুকুন্দ/১৫৫)[৬৯]

যাত্রাকালে শূন্যকুম্ভ দেখা অশুভ নির্ণায়ক—

"গমনকালেতে দেখে অনিষ্ট সূচন।
শূন্য কুম্ভ লইয়া আইসে সীমন্তিনীগণ॥
দক্ষিণে শ্রীগালি দেখে অনুপাম যাএ।
তৈলের পসারি দেখে ডাকিআ বেড়াএ॥
বাদিয়াএ সর্প ধরি সম্মুখে খেলাএ।
বানরিআ ওঝাগণ বানর নাচাএ॥"(দ্বিজ রামদেব/২৬৯)

আবার কিছু কিছু পশুপাখি দেখা শুভসূচক ছিল; মাস, বার, তিথি, কোন কোন গ্রহ, নক্ষত্রও শুভসূচক বলে মনে করা হত। শ্রীমন্তের যাত্রাকালে দৈবজ্ঞ অনুকূল গণনা করে রমাই ঘটক শ্রীমন্তের যাত্রাকাল নির্ধারণ করে—

"শুভক্ষণে রমাই খড়িতে দিল রেখ।
তিন যাত্রা গণিয়া পাইল পরতেক॥
আকাশের কাক যখন ভূমিতে নাহি পড়ে।
হেনহি সময়ে ঈশ্বর মহাদেব লড়ে॥
দুই দণ্ড উদিল যাত্রা করিবারে পাই।
রাজা মারিয়া ভাই রাজ্যপাট লই॥
তিন দণ্ড উদিল যাত্রা করিবারে চাহি।
রাজা না হইলে হয়ে রাজার জামাই॥ (দ্বিজ মাধব/২৩০)

আবার যাত্রাকালে কাক, শকুন ডাকা, কোকিল ডাকা, গোয়ালিনীর দধি বিক্রয় দেখা, পূর্ণকুম্ভ দেখা, সবৎসা গাভী, সদ্যকাটা মাংস, মালীর পুষ্পমালা বিক্রয়, বামদিকে শৃগাল দেখা শুভকর—

"শ্রীমন্তের জাত্রাকালে কাক ডাকে কুতূহলে

কোকিল ডাকে ডালে বসিয়া।

সুন্দর গোয়ালিনী মাথে দধির পসার

জাইছে শ্রীমন্তের আগ বাড়িয়া॥" (মানিক/২৯৭)

দ্বিজ মাধবের কাব্যেও এরকম তথ্য পাওয়া যায়—

"পাটনে যাইতে সাধু দিব্য বিপ্র দেখে।
সীমান্তিনীগণ দেখে পূর্ণ-ঘট কাঁখে॥
পাটনে চলিয়া যায়ে সদাগরের বালা।
নগরে উঠিতে মালী যোগায়ে পুষ্পের মালা॥
চলিয়া যাইতে সাধু ভমরার ঘাটে।
গাভী প্রসবে বৎস দেখয়ে নিকটে॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত লইয়া ডাকে চারিভিতে।
সদ্য-মাংস দেখে সাধু নৌকায়ে চড়িতে॥"(দ্বিজ মাধব/২৩০)

আবার, নর্তকী দেখা, মাহুত সহ হাতি দেখা, মধু বিক্রয় দেখা শুভকর—

"বাহির হইয়া দেখে মঙ্গলসূচন।
পূর্ণকুম্ভ লইয়া আইসে সীমন্তিনীগণ॥
বামেতে শ্রীকালি দেখে ধাএ যুতে যুতে।
মুরজ লইয়া আইসে নটসুতে॥
মাহুত চালাএ দেখে মত্ত করিবর।
সদ্য মৃগমাংস আনে বেচিতে নগর॥
মালা লৈয়া উপনিতি হৈল মালাকার।
আশীর্ব্বাদ করে তানে দৈবজ্ঞকুমার॥
দধি লৈবা দধি লৈবা ডাকে গোয়ালিনী।
মধু লৈবা মধু লৈবা ডাকে মধুআনী॥
আগে আগে পবনে উড়াই লৈ যাএ রেণু।
ডাইনে পলটি দেখে বৎস সমেত ধেনু॥
দেখএ খঞ্জনযুগ খেলে শতদলে।
দ্বিজ রামদেবে গাহে দেবীপদতলে॥" (দ্বিজ রামদেব /৩২৪-৩২৫)

উচ্চবর্ণের বাঙালী সমাজ নয়, নিম্নবর্ণের ব্যাধ সমাজেও এরকম অনেক অশুভ-শুভ নির্ণায়ক বিশ্বাস প্রচলিত ছিল, যেমন- যাত্রাকালে গিরগিটি (গোধা) দেখা অশুভ বলে বিশ্বাস করা হত। কালকেতু বন যাত্রাকালে গিরগিটি দেখে অশুভ মনে করে এবং একারণে সারা দিনে সে একটি শিকারও পায়নি-

"গোধিকা দেখিয়া বোলে তর্জন-বচন।
তোমারে দেখিয়া আজু না পাইলু পশুগণ॥" (দ্বিজ মাধব/৪৮)

কালকেতু বন যাত্রাকালে যেমন শুভকর ঘটনা দেখে তেমনি অশুভকর লক্ষণ দেখে প্রচুর—

"সুবর্ণ-গোধিকা দেখি মহাবীর হৈল দুঃখী
অযাত্রিক পাপ দরশনে।
দেখিনু মঙ্গল যত সকল হইত হত

দৈব দুঃখ দেন সবে গণে॥

গোধিকা যাত্রিক নয় সকল শাস্ত্রেতে কয়

কূর্ম্ম গণ্ডা শশক শল্লক॥" (মুকুন্দ/৪৫)[১০]

কচ্ছপ, গণ্ডার, শশক, শল্লক দেখা যাত্রাকালে অযাত্রা হিসাবে চিহ্নিত। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালনগত কিছু কিছু সংস্কার-বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। যেমন- নারীর বামাঙ্গ স্পন্দন সর্বকালেই শুভ বলে বিবেচিত, ফুল্লরা ঘরে ফিরে আসার সময় তার বাম অঙ্গ স্পন্দিত হয়; এটা মঙ্গলসূচক, কারণ কালকেতু এর পর দেবীর বর লাভ করে—

"বামবাহু স্পন্দে তার স্পন্দে বাম আঁখি।" (ঐ/৫১)[১১]

কখনো বা বাম অঙ্গ স্পন্দন অহিতকর, শ্রীমন্তকে মশানে নিয়ে গেলে দেবীর বাম অঙ্গ স্পন্দিত হয়-

"মশানেতে শ্রীয়মন্তে ভাবে মহামায়ে।

সঘন স্পন্দন করে দেবীর বাম পায়ে॥" (দ্বিজ মাধব/২৬৭)

আবার নারীর ডান অঙ্গ স্পন্দন, খাবার সময় জিহ্বায় দাঁত লাগা, বিষম লাগা অমঙ্গল সূচক—

"কপালে টনক পড়ে অলক ধুতি নাহি উড়ে

স্পন্দন করয়ে ডানি আঁখি।

হেন মনে অনুমানি কিবা মোর হয় হানি

আজি বড় অমঙ্গল দেখি॥

মন উচাটন এবে খাইতে দন্ত লাগে জিভে

চলিতে উছট পদে লাগে।

ভোজনে বিষম খাই মনে বড় দুঃখ পাই

কালপেঁচা ডাকে চারিদিকে॥" (মুকুন্দ/২০৩)[১২]

মানিক দত্তের কাব্যেও দেবী ঐ সকল অমঙ্গল চিহ্নগুলি দেখতে পেয়েছিল। এছাড়া যাত্রাকালে মাথায় চাল ঠেকা অমঙ্গল, আবার পুরুষের ডান অঙ্গ স্পন্দন হিতকর ও মঙ্গলসূচক—

"গুরুবারে দক্ষিণ স্বরে রজনী প্রভাতে।

এহার কারণে মোর স্পন্দিল দক্ষিণ হাতে॥

এহার কারণে খঞ্জন দেখিনু কমলে॥" (দ্বিজ মাধব/৪৭)

এছাড়া ব্যক্তি-কেন্দ্রিক কিছু সংস্কার-বিশ্বাস ছিল, যেমন অপুত্রক জনের মুখদর্শন পাপ। আবার খাদ্যাখাদ্য বাধক কিছু সংস্কারও ছিল।

স্বপ্ন দর্শনকেও বিশ্বাস করা হত। অনেকক্ষেত্রেই স্বপ্ন দর্শন সত্য বলে বিবেচিত হত। কালকেতুকে বন্দি করার পর কলিঙ্গরাজ দুঃস্বপ্ন দেখে এবং বিশ্বাস অনুযায়ী কালকেতুকে মুক্ত করে দেয়। আবার দেখি শ্রীমন্তকে মশানে নিয়ে গেলে দেবী সিংহলরাজকেও স্বপ্নে দর্শন দেয় এবং এগুলি সত্যে পরিণত হয়েছে। সুতরাং স্বপ্নদর্শনে এক জাতীয় বিশ্বাস ছিল।স্থানাশ্রয়ী বিশ্বাস আজও আছে, মধ্যযুগের বাঙালী সমাজেও প্রচলিত ছিল, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে তার পরিচয় পাই। বিভিন্ন তীর্থস্থানের মহিমা, দেবস্থানের মহিমার কথা অত্যন্ত সুবিদিত ছিল। ধনপতি ও শ্রীমন্তের সিংহল যাত্রাকালে যাত্রাপথে সকল তীর্থাস্থানে পূজা করেছে। নবদ্বীপ সে সময়ে তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছিল তাই ধনপতি নবদ্বীপে চৈতন্যদেবের চরণ বন্দনা করে—

"নবদ্বীপে উত্তরিল বেণিয়ার বালা।

চৈতন্য-চরণে সাধু করিল বন্দন॥" (ঐ/১৫৬)

তীর্থের জল পূণ্য ও পবিত্র বলে বিবেচিত হত, তাই নবজাতককে নানা তীর্থের জলে স্নান করানো হত। শ্রীমন্তের

জন্মের পর —

"নানা তীর্থের জল দিয়া স্নান করাইল॥ (মানিক/২৮৫)

গঙ্গাজলের পবিত্রতার কথা মধ্যযুগে বিশেষভাবে ছিল, তাই গঙ্গাস্নান পূণ্যকর্ম বলে মনে করা হত। বিভিন্ন তিথি উপলক্ষে গঙ্গাস্নান করার রেওয়াজ ছিল—

"তৈল্য আঙ্‌লা খুলনা দিল শিরে।
স্নান করে রামা জাঞা গঙ্গা তীরে॥" (ঐ/২৮৯)

মৃত্যুর পর তীর্থস্থানে বা গঙ্গায় অস্থি বিসর্জন একটি বিশেষ প্রথা, মনে করা হত গঙ্গায় অস্থি বিসর্জনে মৃতের আত্মার সদ্‌গতি হয়ে থাকে, তাই গঙ্গাজলে স্নান-তর্পণ করা হত। ধনপতি সিংহল যাত্রাকালে গঙ্গায় স্নান-তর্পণ করে-

"স্নান-তর্পণ যদি কৈল সদাগর।
কুলেত উঠিয়া পূজে দেব গঙ্গাধর॥" (দ্বিজ মাধব/২০৩)

ত্রিবেণী একটি পবিত্র তীর্থস্থান। সেখানে ধর্মপ্রাণ বাঙালী নানা সংস্কার পালন করত—

"বাম ভাগে হালিসহর দক্ষিণে ত্রিবেণী।
দু-কুলের কোলাহলে কিছুই না শুনি॥
লক্ষ লক্ষ লোক একেবারে করে স্নান।
বাস হেম তিল ধেনু কত করে দান॥
রজতের সীপে কেহ করয়ে তর্পন।
গর্তের ভিতরে কেহ করয়ে মুণ্ডন॥
শ্রাদ্ধ করে কোন জন জলের সমীপে।
সন্ধ্যাকালে কোন জন দেয় ধূপ দীপে॥" (মুকুন্দ/১৫৬) [৭৩]

বস্তু-কেন্দ্রিক কিছু সংস্কারও ছিল, তাই গোবর হিন্দু বাঙালীর কাছে অতি পবিত্র। সে কারণে পূজা পার্বণের স্থান গোবর দিয়ে পবিত্র করা হত—

"গোময় আনিঞা পবিত্র কৈল মাটি।
আগর চন্দন আর দিল ছড়া ঝাটি॥" (মানিক/২৮৯)

এপ্রসঙ্গে আশীর্বাদ বা অভিশাপের কথাও বলা যেতে পারে। দেবতার আশীর্বাদ লাভ , গুরুজনদের আশীর্বাদ পরম ফলপ্রসূ বলে বিবেচিত হত। শ্রীমন্ত তাই পিতার খোঁজে যাবার আগে মায়ের এবং দেবীর আশীর্বাদ নিয়েছিল—

"পিতার উদ্দিশে জাই দক্ষিণ পাটন।
তোমার আশীর্ব্বাদে পাই পিতার চরণ॥
চণ্ডীপূজা কৈল সাধু হয়ে সাবধান।
আপন হস্তে ছাগ মহিষ দিল বলিদান॥
প্রতিজ্ঞা করিলাম মাতা তোমার চরণ।
তোমার আশীর্ব্বাদে পাই পিতা দরশন॥" (ঐ/৩০২)

ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতের প্রতি বাঙালীর শ্রদ্ধা-ভক্তি সুবিদিত। ব্রাহ্মণকে দান পূণ্যকর্ম. ধনপতি তাই বাণিজ্য যাত্রার আগে ব্রাহ্মণকে দান করে সন্তুষ্ট করে—

"ব্রাহ্মণেরে স্বর্ণ দিয়া সাধু উঠে নায়ে।
মহানন্দে সদাগরে গঙ্গা বাহি যায়ে॥"(দ্বিজ মাধব/২০৩)

ব্রাহ্মণ, পণ্ডিতের আশীর্বাদ লাভ ফলদায়ক, তাই খুল্লনা বিবাহের পূর্বে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে পাদ্যার্ঘ্য দান করে এবং ব্রাহ্মণ তাকে আশীর্বাদ করে—

"খুলুনার হাতে জল পণ্ডিতকে দিল।
আগে জল থুইয়া রামা প্রনাম হইল।
পুত্রবধূ বলি পণ্ডিত আশীর্ব্বাদ দিল॥ (মানিক/১৯৯)

খুল্লনা-ধনপতির বিবাহের পর রত্নাবতী কন্যা জামাতাকে আশীর্বাদ করেছিল। গুরুজনদের প্রণাম করাও বাঙালী সমাজের বিশেষ রীতি, তাইতো ধনপতি বিদায় কালে শ্বশুরকে প্রণাম করেছে।

দেবতার অর্ঘ্য দেওয়া পুষ্প, দূর্বা, ধান এসবের অসম্ভব শক্তি আছে বলে বিশ্বাস করা হত। মঙ্গলকাব্যে 'অষ্টম' শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ আর দেবী চণ্ডীর অর্ঘ্য 'অষ্ট-দুর্ব্বা তণ্ডুল' শক্তিশালী এবং অসম্ভব সাধন করতে পারে বলে বিশ্বাস করা হত। তাই শ্রীমন্তের বাণিজ্য যাত্রাকালে 'অষ্ট-দুর্ব্বা তণ্ডুল' সঙ্গে দিতে ভোলেনি জননী খুল্লনা-

"হের ধর অষ্ট-দুর্ব্বা মোর স্থানে নেঅ।
আপনে বুঝাইয়া তুন্ধি ছিরা স্থানে দেঅ॥
যখনে দেখয়ে ছিরা বিপদ অপার।
এহা শিরে করি স্মরণ কবির আমারে॥
. . . . . .
পুত্র বুঝাইতে রামা করিলা গমন॥
অষ্ট-দুর্ব্বা তণ্ডুল দিয়া বুঝাইয়া বোলে।
বিপদে ভাবিয় দুর্গা এহা লইয়া শিরে॥" (দ্বিজ মাধব/২২৮)

দ্বিজ রামদেবের কাব্যেও মায়ের কথায় শ্রীমন্ত অষ্ট-দুর্ব্বা তণ্ডুল পাগে বেঁধে নিয়েছে—

"মায়ের বচনে সাধু হইয়া তরাতরি।
শিরপাগে অষ্ট দুর্ব্বা বান্ধে ভিড়ি ভিড়ি॥
মাএরে সান্তাএ শিশু হইয়া যুগপাণি।
প্রণতি করিল আর বিমাতা জননী॥" (দ্বিজ রামদেব/৩২৪)

বাঙালী সমাজে পিতামাতা দেবতুল্য তাইতো পিতামাতার আশীর্বাদ কাম্য। পিতামাতাকে সন্তুষ্ট করা সন্তানের কর্তব্য, হিন্দুশাস্ত্রের এই বিশ্বাস বাঙালী সমাজে বিশেষভাবে মান্য করা হত—

"পিতা স্বর্গ পিতা মর্থ পিতা সকল তীর্থ
পিতা বিনে জীবন বিফল॥" (মানিক/২৮৮)

ঠিক একই ভাবে হিন্দু বাঙালী নারীর কাছে স্বামী গুরুজন এবং সুখ-মোক্ষ দাতা— এজাতীয় বিশ্বাসে বাঙালী নারী প্রতিপালিত ছিল।

আশীর্বাদের বিপরীতে অভিশাপের প্রতিও বিশ্বাস বাঙালীর সহজাত। মঙ্গলকাব্যের দেবতাগণ অভিশাপ দিয়ে দেবসভার নর্তকী বা অপ্সর-অপ্সরীদের পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করাত। বাঙালী বিশ্বাস করত পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ এক অভিশাপের ফল। ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বর শিবের অভিশাপে পৃথিবীতে ব্যাধ রূপে জন্মগ্রহণ করে। ক্রুদ্ধ শিব পার্বতীকে জানায় যে নীলাম্বরকে রক্ষা করতে চাইলে সে তাকেই অভিশাপ দিবে—

"নীলাম্বর রাখিবারে যে কহিব মোরে।
নীলাম্বর এড়ি আজি শাপ দিমু তারে॥(দ্বিজ মাধব/৩২)

সুতরাং নীলাম্বরের প্রতি অমোঘভাবে নেমে আসে অভিশাপ—

"করিলাম লঘু পাপ দিলা নিদারুণ শাপ
ব্যাধ কুলে জনম নিশ্চয়॥" (মুকুন্দ/৩২)[৭৪]

সমাজে সতীত্বের মূল্য ছিল। সতীত্বও একটি সংস্কার মাত্র, সতী নারী সমাজে বন্দিত ও অসতীরা নিন্দিত হত। আমরা দেখি ছদ্মবেশিনী দেবী চণ্ডীকে বিতারিত করার জন্য ফুল্লরা সতী সাবিত্রীর উপাখ্যান শুনিয়ে ছিল। আমরা জানি রামায়ণে সীতার সতীত্ব পরীক্ষাদানের প্রসঙ্গ আছে। মঙ্গলকাব্যেও সতীত্ব পরীক্ষার প্রশ্ন এসেছে। খুল্লনাকে সমাজের চাপে বিভিন্ন পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে সতীত্ব প্রমাণ দিতে হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত তার সতীত্ব প্রমাণিত হয়েছে।

পুরুষের পক্ষে পুত্রসন্তান আবশ্যক; পুত্রসন্তান না থাকলে নরকবাস হয়, পরকালে পিণ্ড-জল দানের কেউ থাকে না এরকম সংস্কার সমাজে প্রচলিত ছিল। পুরুষের এক স্ত্রীর পুত্রসন্তান থাকলে সকলের মুক্তি লাভ সম্ভব; শুধু তাই নয়, ভাগ্যবান পুরুষই বহুবিবাহ করে থাকে বলে বিশ্বাস ছিল, তাই সন্তান লাভের জন্য বহুবিবাহ করা হত। কবিকঙ্কণ লিখেছেন—

"সেই নারী ভাগ্যবতী ধনবান যার পতি
বিবাহ করয়ে দুই তিন।
এক নারী পুত্রবতী সবার উত্তম গতি
সাতিনের পুত্র নহে ভিন॥
বিভা কৈনু পুত্রহেতু স্বর্গ পাইতে ধর্ম্মসেতু
পরলোকে জল-পিণ্ড-দাতা।
যার যত উপচার পুত্র বিনা অন্ধকার
নরকে নাহিক পরিত্রাতা॥" (ঐ/১৪৩)[৭৫]

অপুত্রক ব্যক্তি (আঁটকুড়া) সমাজে নিন্দনীয় ছিল, তার মুখ দেখা অশুভ বলে বিবেচিত হত—

"অপুত্রক যার গারী তার ধনে রাজা বৈরী
পরে লয় আবাস নিবাস।
লোকে নাহি দেখে মুখ এই ত পরম শোক
প্রথম বাসরে উপবাস॥" (ঐ)[৭৬]

আবার বাঁজা, অপুত্রক বা সন্তানহীনা নারীরাও সমাজে নিন্দনীয় ছিল, তাই ধনপতি লহনাকে তিরস্কার করে বলে-

"তুই পাপমতি বাঁঝি হইলি অযশভাজী
কহ মোরে কেমন উপায়।" (ঐ)[৭৭]

এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের সংস্কার-বিশ্বাস ছিল, যেমন— ভাশুর-ভ্রাতৃবধূর সম্পর্ক নিয়ে, স্বামীর নাম না ধরা, জামাইয়ের সামনে শ্বাশুড়ীর ঘোমটা দেওয়া ইত্যাদি। বিধবার আমিষ ভোজন সামাজিক মতে নিষিদ্ধ ছিল। ধনপতির মৃত্যুর কথা প্রচারের পরও খুল্লনা এয়োতি ধারণ করেছে, মাছ খেয়েছে, তাই শ্রীমন্তের পাঠশালার পণ্ডিতমশাই বলেছে—

"মরে গেল ধনপতি শুনি বহুদিন।
মায়ের আয়তি হাতে আমিষ ভোজন॥" (ঐ/১৭২)[৭৮]

এয়োস্ত্রীর হাতে শাঁখা ও সিঁথিতে সিন্দুর ধারণ সামাজিক সংস্কার, তাই লহনা খুল্লনার সব খুলে নিলেও হাতের শাঁখা খুলে নিতে পারেনি—

"দুই গাছি শঙ্খ মাত্র দুই করে থুইয়া।

বিশেষ ছাগল তুন্ধি লওত গণিয়া॥" (দ্বিজ মাধব/১৩৭)

বৈশাখ মাসে বাঙালী বর্ণহিন্দুরা নিরামিষ ভোজন করত, এটি একটি সংস্কার. তাই ফুল্লরার আক্ষেপ—

"বৈশাখ হইল বিষ বৈশাখ হৈল বিষ।
মাংস নাহি খায় লোকে করে নিরামিষ॥"(মুকুন্দ/৫৪)[৭৯]

শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি বাঙালী সমাজে শুভকর্ম বলে সূচিত হত। শুভকর্ম উপলক্ষে নারীগণ শঙ্খধ্বনি করত,উলুধ্বনি দিত। ধান, দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করার প্রথাও প্রাচীন, বাঙালী সমাজে তা পালিত হত। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে এই সমস্ত সংস্কার বিশ্বাসের কথা আছে।

মধ্যযুগীয় বাঙালী সমাজ কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল— তুক্‌তাক্, ঝাড়ফুঁক, মারণ-উচাটন, বশীকরণ, তান্ত্রিকতা, অলৌকিকতার প্রতি এক জাতীয় সহজাত বিশ্বাস ছিল। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে সংস্কারাচ্ছন্ন বাঙালীর চিত্র আছে। অলৌকিক ঘটনাগুলি সামাজিক ইতিহাসের বিষয় নয় কিন্তু বাঙালী চরিত্রের বিশেষত্ব হিসাবে পরিগণিত হতে পারে। দৈববাদী বাঙালী চমৎকারিত্বে আত্মতৃপ্তি পেত, তাই মঙ্গলকাব্যে এসবের প্রতি কবির আনুগত্য দেখি। ধনপতি বাণিজ্য যাত্রাকালে নিমগাছে ওড় পুষ্প দেখে মুগ্ধ হয়, তীর্থের মহিমা তার মনে সঞ্চারিত হয়—

"নিমাই দত্তের ঘাটে গেল সাধুর নন্দন।
নিম গাছে ওড় পুষ্প অপূর্ব্বলক্ষণ॥" (দ্বিজ মাধব/২০৪)

ব্রতকথা ও মঙ্গলকাব্যে আমরা কনিষ্ঠের বা কনিষ্ঠার অলৌকিক ক্ষমতা দেখি। খুলনা (ধনপতির কনিষ্ঠা স্ত্রী) দেবীর কৃপায় অসাধ্য সাধন করে সতীত্বের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। সতীত্বের মহিমায় আগুন শীতল চন্দনে পরিণত হয়। তাই কবি লিখেছেন—

"খুল্লনার হাতে অগ্নি তুষারশীতলে।" (মুকুন্দ/১৪৭)[৮০]

মারণ-উচাটন-বশীকরণ এগুলিও একেকটি লোকায়ত করণ-প্রক্রিয়া; কন্যার বিবাহে বাঙালী জননীগণ অনাগত আশঙ্কায় জামাতা বশীকরণের ঔষধ করত। আবার স্ত্রীরাও স্বামী বশীকরণের জন্য ঔষধ করত, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে এই বিষয়গুলি অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেখি খুল্লনার জননী মালিনী-তেলিনী সইয়ের পরামর্শে জামাতা বশীকরণের ঔষধ সংগ্রহ করেছে। তার উপকরণ এরকম—

"আইসানি চাউলানি চিলের ভাষার খড়ি
আর খুলুনার চুলের তেলে।
চাপা কলাত করি জামাইকে খাওয়াইলে
ভালবাসিবে চিরতকালে॥" (মানিক /২০৩)

দ্বিজ মাধবের কাব্যে দেখি ধনপতি পিঞ্জর আনয়নার্থ গৌড়ে গমন করলে লহনা সই ব্রাহ্মণীর পরামর্শে সপত্নী বিতারণের ঔষধ করতে উদ্যত হয়, এর মধ্যে লৌকিক বিশ্বাস ও ক্রিয়া প্রকাশিত। তার পদ্ধতি নিম্নরূপ—

"অমাবস্যা মঙ্গলবারে পূর্ণবেলা দুই প্রহরে
কালা কুক্কুরী মারিমু।
. . . . . .
উড়াইয়া দিমু তাইরে রহিতে নারিব ঘরে
সতিনীর ঘুচাইমু ঝগড়া॥"(দ্বিজ মাধব/১৩৬)

মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যে আমরা একইভাবে ঔষধীকরণ দেখি। যেমন খুলনার বিবাহে জামাতা বশীকরণের ঔষধীকরণ নিম্নরূপ—

"কাটা মহিষের আনে নাসিকার দড়ি।

দুর্গার প্রদীপ পুঁতে রেখেছিল চেড়ী॥
সাধুর কপালে যাবে দিব পুনর্ব্বসু।
খুল্লনার হবে সাধু নাকবিন্ধা পশু॥
আনিল পাকড়ি ডাল হাঁই আমলাতি।
আকুল কুন্তল করি আনে মধ্য রাতি॥
সাপের আঁটুলি আনে খুঁজে বেদের ঘরে।
কই মৎস্য-পিত্ত আনে মঙ্গল বাসরে॥
কাপাসের ক্ষেত হৈতে আনিল গোমুণ্ড।
দাণ্ডাইয়া রবে সাধু তায় দুই দণ্ড॥
খুল্লনা করয়ে যদি সাধুর অপমান ।
মৌনে রবে সাধু যেন গোমুণ্ড সমান॥"(মুকুন্দ/৯৯-১০০)[৮১]

লীলাবতীর পরামর্শে লহনা স্বামী বশীকরণ এবং সতীন বিতাড়ানের ঔষধ করে—

"পত্রিকার কলাগাছ রোপিয়া অঙ্গনে।
ঘৃতের প্রদীপ তাহে দিবে রাত্রি দিনে॥
. . . . . .
ঔষধ প্রবন্ধে কহে মুকুন্দ বিশারদ।
বুড়াকে না করে গুণ মোহন ঔষধ॥" (ঐ/১০৮-১০৯)[৮২]

বস্তুত বাঙালী সমাজের নারীপুরুষরা এই সমস্ত তুক্-কর্মে সিদ্ধ হস্ত ছিল, মুকুন্দ চক্রবর্তী নিজেও বোধ হয় নানান ঔষধীকরণ জানতেন। শুধু কি তাই, অপুত্রবতীর সন্তান ধারণের জন্য ঔষধীকরণ হত। আমরা দেখি নিঃসন্তান নিদয়াকে ভগবতী সন্তান ধারণের ঔষধ দিয়েছে—

"শুনহ নিদয়া তুমি ঔষধ জানি আমি
মিথ্যা নহে বচন আমার।
স্নান করহ তুমি ঔষধ দিব আমি
বংশধর হইবে তোমার॥" (ঐ/৩৪)[৮৩]

মারণ-বশীকরণ-ঔষধীকরণ ছাড়া জলপড়া, তেলপড়া, ধুলোপড়া, হাত চালনা, বাটি চালনা, সাপের বিষঝাড়া ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার করণ-প্রক্রিয়া মধ্যযুগীয় বাঙালী সমাজে আষ্টেপৃষ্ঠে গেঁথে ছিল।বিভিন্ন কবির কাব্যে উল্লিখিত সংস্কার-বিশ্বাসের ক্ষেত্র থেকে আমরা দেখি সমগ্র বাংলাদেশের জনসমাজ একই রূপ সংস্কারে বিশ্বাসী ছিল, তবে কবিদের অঞ্চল ভেদে বা কাল ভেদে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় অর্থাৎ এক স্থানে যা শুভ দ্যোতক অন্যত্র তা অশুভ আবার এক স্থানে যা অশুভ অন্যত্র শুভকর ছিল।তন্ত্র-মন্ত্র, ঔষধীকরণ বা বশীকরণ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন কবিই ঔষধীকরণ বা তুক্তাক্ রীতি বর্ণনা করেছেন তবে তার ভিতরে একটা পার্থক্য আছে অর্থাৎ বিভিন্ন অঞ্চল বা কালভেদে বিভিন্ন রকম করণ-প্রক্রিয়া প্রচলিত ছিল। অন্যভাবে বলা যায় সমাজ বিবর্তনের ধারায় সকল লোকাচার বা বিশ্বাস-সংস্কারই পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। এই সমস্ত করণ-প্রক্রিয়া ও বিশ্বাসের মধ্যে দিয়ে সমাজের অভ্যন্তরীণ গঠন ধরা যায়। যে সমাজে জটিলতা নেই কিংবা যেখানে বাধা নেই সেখানে এসমস্ত করণ-প্রক্রিয়া নিস্প্রয়োজন ছিল। কালকেতুর ব্যাধ সমাজ সরল বিশ্বাসী. তাই কালকেতুর বিবাহে ফুল্লরার জননী ঔষধীকরণের প্রয়োজন বোধ করেনি। আবার শ্রীমন্তের বিবাহে আমরা ঔষধীকরণের কথা পাইনি. কারণ শ্রীমন্ত পিতামাতার একমাত্র সন্তান এবং তার উপর দেবীর আশীর্বাদ পুষ্ঠ।

অতঃপর আসা যাক্ আচার-বিচারগত বা অনুষ্ঠানগত ঐতিহ্যের কথায়। বাঙালী সমাজ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নানান লোকাচারে আচ্ছন্ন ছিল। চণ্ডীমঙ্গলের কবিগণ আপন অঞ্চলের লোকাচার, যথা— নবজাতকের জন্ম সংক্রান্ত লোকাচার, প্রসূতির গর্ভকালীন লোকাচার, বিবাহকালীন লোকাচার এবং মৃত্যুকালীন লোকাচারসমূহ নিজ নিজ অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেছেন। প্রথমে আমরা আসি প্রসূতির প্রসবকালীন সংস্কারের কথায়। প্রসবের পূর্বে প্রসূতিকে নিয়ে কতকগুলি আচার পালিত হত, যেমন— পঞ্চামৃত ভক্ষণ ও সাধভক্ষণ। এই অনুষ্ঠানে প্রসূতির পাঁচ মাস গর্ভকালে পঞ্চামৃত ভক্ষণ করানো হত, তবে উল্লেখযোগ্য আচার হল সাধভক্ষণ। গর্ভাবস্থায় প্রসূতির সাধ অনুযায়ী পরিতোষপূর্বক আহার করানোই সাধভক্ষণ । এই আচারে সাধ্য অনুসারে সাধ পূরণ করা এবং সেই সঙ্গে প্রসূতিকে নানা উপহার দেওয়া হত। সাধারণত সাত মাস গর্ভকালীন অবস্থায় প্রসূতিকে সাধভক্ষণ করানো হত। মানিক দত্তের কাব্যে পাই—

"ছয়মাসের গর্ভ রামা বাড়িল তখন।
সপ্তমাসে সাধ খায় খুলুনা নারিগণ॥"(মানিক /২৮২)

এর পরেই খুল্লনার সাধ অনুযায়ী কি কি আহার করানো হল তার বিবরণ আছে। দ্বিজ মাধবের কাব্যে 'খুল্লনার সাধভক্ষণের ইচ্ছা' অংশে তার সাধের বিবরণ পাই—

"লহনা দিদি ল নিবেদহু তুয়া পায়ে।
সাধ খাইতে ইচ্ছা হইছে আহ্মায়ে॥
পাকা চোলঙ্গ পাম যদি।
কামরাঙ্গা খাউ নিরবধি॥
অখনে পাম পাকা বদরী।
হেন ইচ্ছা বদনেতে পুরি॥
দ্বিজ মাধবে রস গায়ে।
সাধের শাক তুলিতে দুবা যায়॥" (দ্বিজ মাধব/২১৩)

কবিকঙ্কণের কাব্যে নিদয়ার সাধভক্ষণ ও খুল্লনার সাধভক্ষণের কথা আছে। মুকুন্দ চক্রবর্তী অনেকক্ষেত্রেই ব্যাধ সমাজের কথা বলতে গিয়ে নিজ সমাজ বাস্তবতার চিত্র এঁকেছেন। দ্বিজ রামদেবের কাব্যেও খুল্লনার সাধভক্ষণের চিত্র আছে—

"খুলনাএ বোলে দিদি কি বলিমু আর।
সদাএ খাইতে শ্রদ্ধা অমূল্য দ্রৈর্ব্ব সার॥
লহনাএ বুঝিলেক সতার ইঙ্গিত।
শাক আনিতে দুবা পাঠাএ তুরিত॥" (রামদেব/২৮৯)

সাধভক্ষণের কথা বলতে গিয়ে কবিগণ বিস্তৃত খাদ্য তালিকা তুলে ধরেছেন। সামাজিক ইতিহাসে. সাধভক্ষণ অংশের গুরুত্ব এই, এর মধ্যে সেকালের খাদ্য তালিকার বিস্তৃত বিবরণ পাই। আমিষ-নিরামিষ, পিঠা পায়েস এমন কি বিভিন্ন প্রকার শাকের বিবরণও এখানে পাওয়া যাচ্ছে। সাধভক্ষণে শাক বোধ হয় অত্যন্ত আবশ্যক ছিল, তাই মুকুন্দ চক্রবর্তী ছাড়া সকল কবিই দুর্বলার শাক তোলার বিবরণ দিয়েছেন। তা থেকে কত বিচিত্র শাক খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হত তার বিবরণ পাওয়া যায়। লক্ষণীয় বিষয়, শাকগুলি কিন্তু গ্রামের আনাচ-কানাচ থেকে সংগ্রহ করা। আর একটি বিষয় লক্ষণীয়. কবিকঙ্কণ নিদয়ার সাধভক্ষণের চিত্র তুলে ধরেছেন, কিন্তু আর কোন কবিই নিদয়ার সাধভক্ষণের কথা বলেননি। মনে হয় ব্যাধ-অন্ত্যজ সমাজে সাধভক্ষণের মত ঘরোয়া অনুষ্ঠান সম্ভব ছিল না। এখানে কবিকঙ্কণ যে বিস্তৃত খাদ্য তালিকা দিয়েছেন তাতে মনে হয় ধর্মকেতুর মত দরিদ্র ব্যাধের পক্ষে তা সংগ্রহ

করা সম্ভব ছিল না; সুতরাং ঐ চিত্র ব্যাধ সমাজের বাস্তব চিত্র নয়, ব্যাধ সমাজের ইতিহাসের উপকরণ নয়। নবজাতকের জন্মের পরও বিভিন্ন রকম আচার পালিত হত এবং আচারগুলি হল ক্রমান্বয়ে— নাড়িকা ছেদন, পাঁচ দিনে পাঁচুটা, ছয় দিনে ষেটেরা, আট দিনে আটকলাই, নয় দিনে নত্তা, একুশ দিনে ষষ্ঠীপূজা ইত্যাদি। শ্রীমন্তের জন্মকালে এবং জন্মের পর ক্রমান্বয়ে যে অনুষ্ঠান আচার পালন করা হয়েছিল তা নিম্নরূপ—

"সুবন্ন কাটারি দিয়া নাড়ি ছেদ কৈল।
ব্রহ্মা হুতাশন দিয়া পবিত্র করিল।" (মানিক/২৮৫)

এবং তারপর—

"তিনদিনের ছ্যালা ধূল বাড়াইল॥
পঞ্চ দিনের ছ্যাল্যা পাচটি করিল।
পুত্র কোলে করি খুলনা দুয়ারে বসিল॥
ষষ্ঠী পূজিতে জদি খুলনা নড়িল।
আইহগণ আসি তথা জয়ধ্বনি দিল॥
. . . . . .
একমাসের হৈল জদি সাধুর নন্দন।
তবে তারে করাইল ই নামকরণ॥
. . . . . .
ক্ষেনে হাসে ক্ষেনে কান্দে সাধুর নন্দন।
ছয়মাসে হৈল তার অন্ন পরাশন॥" (ঐ/২৮৫-২৮৬)

ধনপতি ও খুল্লনার জন্মকালেও একই ধরনের আচার পালিত হয়। এর পরবর্তী স্তরে নবজাতকের পাঁচ বছর বয়সে চূড়াকরণ ও হাতেখড়ি দেওয়ার অনুষ্ঠান হত। যেমন —

"পঞ্চ বৎসরের কালে কৈল চূড়াকরণ।"(ঐ/১৮১)

কিংবা, শ্রীমন্তের বাল্যকালে—

"শুভক্ষণ গণিঞা ছাল্যাকে দিল খড়ি।" (ঐ/২৮৬)

দ্বিজ মাধবের কাব্যে ধনপতির জন্মকালেও অনুরূপ আচার পালন করা হয়। তবে দ্বিজ মাধবের কাব্যে আচারসমূহ অপেক্ষাকৃত স্বল্প। দেশাচার ভিন্ন দেশে ভিন্ন হয়, তাই দ্বিজ মাধবের কাব্যে আচার একটু পৃথক এবং স্বল্প—

"ছয় দিনে পূজা কৈল ষষ্ঠী দেবতারে।
ছয় মাস আসিয়া হইল উপনীতি।
অন্ন দিয়া পুত্রের নাম থুইল ধনপতি॥
. . . . . .
পঞ্চম বরিষ হইল সাধুর নন্দন।
কর্ণ বেধ করাইল চূড়াকরণ॥" (দ্বিজ মাধব/১১৫-১১৬)

মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যেও আমরা ষোড়শ শতাব্দীর বাঙালী সমাজে পালিত আচার পাই। যেমন খুল্লনার জন্মকালে পালিত আচারসমূহের বিবরণ—

"হুলাহুলি দিয়া কৈল নাভির ছেদন।
তিন দিনে কৈল রামা সুপথ্য পাঁচন॥
ছয় দিনে ষষ্ঠীপূজা কৈল জাগরণে।

অষ্ট-কলাই তারপর কৈল অষ্ট দিনে॥
নত্তা কৈল নয় দিনে মনের হরিষে।
একুইশা কৈল তার একুশ দিবসে॥
খুল্লনা থুইল নাম পরিপূর্ণ মাসে।
. . . . . .
করিল শ্রবণ-বেধ পঞ্চম বরষে।
মনোহর বেশ রামা দিবসে দিবসে॥" (মুকুন্দ/৯২)[৮৪]

নবজাতকের জন্মকালে বাঙালী সমাজে প্রসূতিকে আঁতুর ঘরে রাখা হত। সন্তানের মঙ্গল কামনায় এবং কু-দৃষ্টি থেকে রক্ষা পাবার জন্য সেখানে আগুন জ্বালিয়ে রাখার ব্যবস্থা করা হত এবং দুয়ারে গোমুণ্ড স্থাপন করা হত-

"চালের ফাড়িয়া খড় জ্বালিল আঁতুড়ি।
গোমুণ্ড দুয়ারে আনি পূজে ষষ্ঠীবুড়ী॥"(ঐ)[৮৫]

ব্যাধ সমাজের আচার-বিচার বর্ণনা করতে গিয়ে নবজাতকের জন্মকালে পালিত সংস্কার-সমূহের বিবরণও কবিগণ দিয়েছেন।কালকেতুর জন্মকালে পালিত আচারসমূহ বিভিন্ন কবির কাব্যে বর্ণিত হয়েছে, তার সঙ্গে উচ্চবর্ণের সমাজে পালিত আচারসমূহের কোন পার্থক্য নেই, তবে অনেকক্ষেত্রেই পালিত আচারসমূহ সংক্ষিপ্ত।

যৌবনকালে পালিত আচারসমূহের মধ্যে প্রধান বিবাহকালীন আচার। বিবাহ নামক সামাজিক অনুষ্ঠানটি ক্রমান্বয়ে কতকগুলি আচারের মধ্যে দিয়ে পালিত হত, যেমন— গায়েহলুদ, অধিবাস, মঙ্গলসূত্র বন্ধন, নান্দীমুখ, ক্ষৌরকর্ম, জামাতা বরণ, সাতপাক, মালাবদল, শুভদৃষ্টি, সম্প্রদান, বাসর-যাপন, শয্যাতুলুনি, বাসিবিয়ে, কনে বিদায়, বধূবরণ, কালরাত্রি, ফুলশয্যা, ইত্যাদি। মঙ্গলকাব্যে সকল স্তরের আনুপূর্বিক বর্ণনা না থাকলে উল্লিখিত আচারসমূহের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা আছে। অঞ্চল ভেদে বিবাহাচারে যে ভিন্নতা ছিল চণ্ডীমঙ্গলের তিন প্রধান কবির বর্ণনা থেকে তা বোঝা যাবে।

মানিক দত্তের কাব্যে বিবাহাচার শুরু হয়েছে 'জলসওয়া' নামক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে—

"জায় রম্ভা জল সাধিবারে।
জল সাধে প্রতি ঘরে ঘরে।" (মানিক/২০৬)

এবং সেই সঙ্গে পান-সুপারি দিয়ে নিমন্ত্রণ করার রীতি পালিত হত। বর কন্যাগৃহে উপস্থিত হলে তাকে পাদ্যার্ঘ দিয়ে বরণ করে নেওয়া হত। ছায়ামণ্ডপে বর-কনেকে নিয়ে প্রথমে 'সাতপাক' পরে ক্রমান্বয়ে স্ত্রীআচারসমূহ পালিত হত। যেমন—

"হেটমুণ্ড হইয়া রামা খুলুনা বারাইল।
স্বামীকে বেড়িয়া রামা সপ্তপাক দিল॥
হরিধ্বনি দিঞা মালা গলে তুলি দিল।" (ঐ/২০৯)

এরপর কন্যা সম্প্রদানের পূর্বে জামাতাকে নানান দ্রব্য উপহার দেওয়ার রীতি এবং শেষে কন্যা সম্প্রদান ও বাসরযাপন করা হত। পরদিন এয়োদের নানা রকম স্ত্রীআচার পালন করার পর বর-কন্যাকে বিদায় দেওয়া হত। নববধূকে শ্বশুর বাড়ীতে বরণ করে নেওয়া হত এবং জ্ঞাতি ভোজনের মধ্যে দিয়ে বিবাহ শেষ হত—

"সকলিকে ধনপতি ভোজন করাইঞা।
বিদায় দিলেন সাধু পুরস্কার দিয়া॥"(ঐ/২১২)

দ্বিজ মাধবের 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত' কাব্যে পূর্ববঙ্গীয় বিবাহাচার দেখা যায়। এখানে 'অধিবাস' নামক আচারের মধ্যে দিয়ে বিবাহের সূত্রপাত—

"উজানীর সমাচার পাইয়া সদাগর।
শুভক্ষণে অধিবাস কৈল খুলনার॥"(দ্বিজ মাধব/১২৩)

তারপর নারীরা জলসইত এবং নানা রকম স্ত্রীআচার পালন করত। কলাগাছ পুঁতে ছায়ামণ্ডপ তৈরী করা হত। ছায়ামণ্ডপের নিকট পুকুর কেটে হল জলপূর্ণ করা হত। তারপর নানা রকম ঔষধ, হলুদ, চন্দন একত্রিত করে গায়ে মাখানো হত এবং শেষে এয়োগণ জল ঢেলে বর বা কনেকে স্নান করিয়ে দিত। এরপর কনে বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিত হয়ে থাকত আর বর বরযাত্রী নিয়ে কন্যাগৃহে উপস্থিত হত। যেমন—

"মঙ্গল পোখরী কৈল বিচিত্র নির্ম্মাণ।
রামকদলী তরু রুয়িল চারি কোণ॥"

. . . . . .

খুলনা লইয়া তবে যথ বন্ধুগণ।
বিবাহের বেশ সবে করায়ে তখন॥ (ঐ/১২৪-১২৫)

এদিকে কনের পিতা ষোড়শমাতৃকাপূজা, বসুধারা দান ও নান্দীমুখ সমাপন করত। বর কন্যাগৃহে উপনীত হলে পাদ্যার্ঘ দিয়ে, বস্ত্রালঙ্কার দিয়ে বরণ করে নেওয়া হত। এরপর বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে দিয়ে কন্যা সম্প্রদান করা হত। বিবাহ শেষে অগ্নিপূজা বা হোম এবং বাসরযাপন, পরদিন কন্যা বিদায়। এ ভাবে একটি পরিপূর্ণ আচার শেষ হত—

"সম্প্রদানের বাক্য সাধু উচ্চারে বদনে।

. . . . . .

নিজ গৃহে আসিবারে করিল মেলানি।
মায়ের অঞ্চলে ধরি কান্দয়ে খুলনী॥ (ঐ/১৩০)

মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যে বিবাহরীতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। প্রথমে 'অধিবাস' নামক আচার পালিত হত। মুকুন্দ চক্রবর্তী অধিবাসের প্রয়োজনীয় উপকরণ এবং অধিবাস পদ্ধতির বর্ণনা দিয়েছেন। তারপর ষোড়শমাতৃকাপূজা, বসুধারা দান, নান্দীমুখ ইত্যাদি—

"ঘৃত দিয়া সাত ডোরা কাঁথে দিল বসুধারা
কৈল নান্দীমুখের বিধান।" (মুকুন্দ/৯৯)[৮৬]

কন্যাগৃহে বর ও বরযাত্রীদের আগমন হলে বরের দুয়ার ধরা হত, যেমন—

"দুই দলে ঠেলাঠেলিচুলাচুলি গালাগালি
বরাত দেউড়ি নাহি ছাড়ে।" (ঐ/১০০)[৮৭]

কবিকঙ্কণের কাব্যে কনের মাতা সুতা দিয়ে বরের অধর ও হাত পরিমাপ করে এবং সেই সুতা সাত ফের করে কনের আঁচলে বেঁধে দেয়, যাতে বর কনের সঙ্গে সাতপাকে বাঁধা পড়ে এবং বশীভূত থাকে। এদিকে স্ত্রীআচারসমূহ পালিত হত এবং কনের পিতা যথারীতি বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে দিয়ে কন্যা সম্প্রদান করত। সেই দিন রাত্রে বাসরযাপন ও পরদিন শয্যাতুলুনি—

"শয্যা ত্যজি প্রভাতে উঠিলা ধনপতি॥
শয্যাতোলা কড়ি চাহে পরিহাস্য জন।" (ঐ/১০১)[৮৮]

এর পরের দিনের অনুষ্ঠানের শেষে নানান মঙ্গলবাদ্য বাজনের মধ্যে দিয়ে বর-কনেকে নানান দ্রব্য উপহার দিয়ে বিদায় দেওয়া হত। এদিকে জ্ঞাতি ভোজনের মধ্যে দিয়ে বিবাহ শেষ হত—

"যোতুক দিলেন রত্ন বস্ত্র বন্ধুগণ।

নানা উপচারে সাধু করায় ভোজন॥"(ঐ/১০১)[১৯]

দ্বিজ রামদেবের কাব্যেও অনুরূপ আচারসমূহ সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে। দ্বিজ রামদেবের কাব্যে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ হল ধনপতি খুল্লনার 'পুনর্বিবাহ'। যুবতী খুলনা পথেঘাটে ছাগল চরাবার জন্য কলঙ্ক রটে, গ্রামীণ সমাজে সমালোচনার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য খুল্লনার 'পুনর্বিবাহ' হয়—

"মহোৎসবে গেল যদি দিন পঞ্চদশ।
পুনর্বিবাহ করিবারে সাধু হইল রস॥" (দ্বিজ রামদেব/২২৯)

মঙ্গলকাব্যের কবি 'ব্যাধখণ্ডে' কালকেতুর বিবাহ প্রসঙ্গে বিবাহাচারের বর্ণনা করেছেন—

"কালকেতুর অধিবাস বাদ্যি বাজে রাইবাশ
বাদ্য বাজে দামা দগড়া।
. . . . . .
তাম্বুল অভাবে তেত্তার ছাল দিল
পদে ২ করিয়া জিজ্ঞাসা।" (মানিক/৬৬)

এই বর্ণনা ব্যাধ সমাজের বাস্তবতাকে বহন করে। কবিকঙ্কণ কালকেতুর বিবাহাচারের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা সম্পূর্ণ উচ্চবর্ণের হিন্দুসমাজের অনুরূপ, এই বর্ণনা কিন্তু ব্যাধ ঘরের বিবাহের বর্ণনা নয়। আবার দ্বিজ রামদেব কাব্যে কালকেতুর বিবাহাচারের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা ব্যাধ সমাজের অভিজ্ঞতা বহন করে—

"বিবাহ নির্ব্বন্ধ দিন কৈল বুধবার।
ব্যাধপত্নীসবে করে উৎসব আচার॥
ইটাল সিন্দূর আনি ঘসি দিল শিরে।
পঞ্চ জন তুষ্ট করে এক এক বারে॥
. . . . . .
জ্ঞাতির ভোজন হেতু গেল অর্দ্ধ রাত্রি।
পরিণয় করে কেতু ফুলরা যুবতী॥"(রামদেব/৫১)

মুকুন্দ চক্রবর্তী ছাড়া অন্যান্য কবিদের কালকেতুর বিবাহাচার বর্ণনা সমাজ বাস্তবতাকে বহন করেছে।

মধ্যযুগের বাঙালী সমাজে বিবাহ উপলক্ষে পণপ্রথা প্রচলিত ছিল, তাছাড়াও বর-কনেকে নানান দ্রব্য উপহার দেওয়া হত। মানিক দত্তের কাব্যে পাই ধনপতির বিবাহে কি কি যৌতুক দেওয়া হয়েছিল—

"জামাতাকে দিল দান রজত কাঞ্চন।
মণিমুক্তা প্রবাল দিল বহুমূল্য ধন॥"(মানিক/২১০)

শ্রীমন্তের বিবাহে সিংহলরাজ কন্যাকে নানা দ্রব্য যৌতুক দিয়েছিল, যেমন—

"সুশীলা কন্যারে দিল অর্দ্ধরাজ্য ধন।
ধবল চামর দিল বিচিত্র পাটন॥
. . . . . .
দুই শত হস্তী দিল বৎসসহিত॥" (দ্বিজ মাধব/২৮৩)

সেকালে জামাতাকে কন্যার সহিত দাসী উপহার দেবার প্রথাও ছিল—

"সুশীলা-সেবনহেতু পরম রূপসী।
রত্নে বিভূষিত দিল দুই শত দাসী॥" (ঐ)

কবিকঙ্কণের কাব্যেও জামাতা ধনপতিকে যৌতুক দেওয়া হয়েছে বহুমূল্য সম্পদ—

"নানা রত্নে জামাতার কৈল পুরস্কার।
দিলেন দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ দশ ভার॥" (মুকুন্দ/১০১)[১০]

উচ্চবর্ণের সমাজের মত ব্যাধ সমাজেও দান ও যৌতুক প্রথা প্রচলিত ছিল, তবে দানের বিষয় ছিল অতি সামান্য। মানিক দত্তের কাব্যে কালকেতুর বিবাহে দান দেওয়া হয়েছে 'দেড় বুড়ি কড়ি', 'ছিড়া কাল দড়ি', 'শুকতের টোনা', আর কিছু কাঁসা-পিতল। দ্বিজ মাধবের কাব্যে পণ নিয়ে পাত্র ও পাত্রী পক্ষকে দরাদরি করতে দেখা যায়, কিন্তু পণ অতি যৎসামান্য ছিল—

"পণ নিয়ম করি তুহ্মি যাহ ঘর।
সর্ব্বথায়ে দিব বিহা আন গিয়া বর॥
. . . . . .
ধর্ম্মকেতু বোলে সখা করি দরাদরি।
একখান খঞিয়া দিমু কড়ি নয় বুড়ী॥" (দ্বিজ মাধব/৩৮)

তাছাড়া বিবাহে কালকেতুকে দানে দেওয়া হয়েছিল—

"ভাঙ্গা নারিকেল দিল পুরান ধনুখান।
বসিবারে মৃগচর্ম্ম দিল বিদ্যমান॥" (ঐ/৩৯)

দানের মত বিবাহের উপচারও যৎসামান্য এবং এতে দারিদ্র্যের সুস্পষ্ট ছাপ বিদ্যমান—

"গণ্ডা তের কড়ি লইয়া বীর গেল হাটে॥
. . . . . .
চা'র কড়ার পান কিনে এক কড়ার চুন।
তিন কড়ার মরিচ কিনে দুই কড়ার নুন॥"(ঐ/৩৮)

কবিকঙ্কণের কাব্যেও দেখি পণ নিয়ে দরাদরি করতে—

"পণের নির্ণয় কৈল দ্বাদশ কাহন।
ঘটকালি ওঝা তুমি পাবে বার পোণ।
পাঁচ গণ্ডা গুয়া পাবে গুড় দুই সের।
ইহা দিলে আর কিছু না করিও ফের ॥"(মুকুন্দ/৩৭)[১১]

আর যৌতুক হিসাবে দেওয়া হয়েছিল—

"যৌতুক ধনুক খান তিন তীর খরশাণ
আরো দিল যে ছিল বিধান॥" (ঐ/৩৮)[১২]

বাঙালীর বিবাহে ঘটক-প্রথা প্রচলিত ছিল, ঘটক হল বিবাহের যোজক। ঘটকের দ্বারা দুই পক্ষ একত্রিত হয়ে বিবাহ সংঘটিত হত।কালকেতুর বিবাহে ঘটক হল সোমাই ওঝা। ধনপতি-খুল্লনার বিবাহে ঘটক জনাই পণ্ডিত। ধনপতি জনাই পণ্ডিতকে ঘটক করে খুল্লনার পিতৃগৃহে পাঠিয়ে ছিল—

"জনাই পণ্ডিত সাথে করিয়া বিচার।
বলে সম্বন্ধ করিয়া কর আমার উদ্ধার॥
এমন শুনিয়া দ্বিজ সাধুর বচন।
ত্বরা করি গেল লক্ষপতির সদন॥"(ঐ/৯৪)[১৩]

সমাজে এই ঘটকদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল, এই ঘটকরা পাত্রপাত্রী উভয় পক্ষ থেকে অর্থ পেত। ব্যাধ সমাজেও ঘটক সোমাই ওঝা বিবাহের যোজক হিসাবে কাজ করার বিনিময়ে অর্থ পেয়েছে। বিবাহের পূর্বে পাত্রপক্ষ কন্যা

দর্শনে যেত এবং শেষে কন্যাকে 'দর্শনী' দেওয়া হত—

"গোলহাটে পণ দিল দ্বাদশ কাহন।
কন্যার দর্শনী দিয়া করিল লগন॥" (ঐ/৩৭)[১৪]

মধ্যযুগে রজঃস্বলা হবার আগেই কন্যার বিবাহ দেওয়ার নিয়ম ছিল এবং অবিবাহিত কন্যা সম্পর্কে স্মৃতিশাসিত সমাজে নানা বিধি প্রচলিত ছিল। ব্রাহ্মণ্যশাসিত কুলীন সমাজের বিধি অনুসারে অষ্টম বৎসরে কন্যার বিবাহ দেওয়া উচিত। মানিক দত্তের বর্ণনায়—

"ক্রোধ হৈয়া পণ্ডিত বলে রম্ভাবতীর তরে।
অষ্ট বৎসরের কন্যা বৈসে তোমার ঘরে॥
. . . . . .
সাত বৎসরের হৈলে ছুত হয়ে নারী।
দশ বৎসরের হৈলে পূর্ন কুমারী॥
এগার বৎসর হৈলে চঞ্চল হয়ে চিত।
বার বৎসর হৈলে পুষ্প বিগশিত॥
তোমার খুলুনা হৈল সপ্ত বৎসরে।
এহি সময় বিবাহ দেহ ধনপতির তরে॥"(মানিক/১৯৯-২০০)

মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যে বলা হয়েছে নবম বৎসরের কন্যার বিবাহ দিলে ধর্ম-কুল সবরক্ষা পায়, না হলে নরকবাস হয়। সমাজে এরূপ ধারণা প্রচলিত ছিল—

"বার বৎসরের সুতা তব ঘরে অবস্থিতা
কেমনে আছহ সুস্থমতি।
সপ্তম বৎসরের কন্যা বিয়া দিলে হয় ধন্যা।
তার পুত্র কুলের পাবন॥
. . . . . .
নর দেখি অভিরাম কন্যা যদি করে কাম
পায় পিতা নরকে যন্ত্রণা॥"(মুকুন্দ/৯৫)[১৫]

মৃত্যুতে মানব জীবনের পরিণতি, তাই মৃত্যুর পরও নানান আচার পালিত হত। হিন্দু বাঙালীর মৃত্যুর পর প্রথম আচার হল মৃতদেহ সৎকার করা। বাঙালী হিন্দুরা মৃতদেহ দাহ করে থাকে।কাঠের চিতায় মৃতদেহ শুইয়ে দিয়ে অগ্নিসংযোগ করা হয়ে থাকে, একে বলে 'অগ্নিসংস্কার'।প্রথম অগ্নিসংযোগ করাকে বলে মুখাগ্নি। মৃত্যুর পর অশৌচ পালন করা হত, সাধারণত এক মাসের অশৌচান্তে 'মৃতাকার্য' অর্থাৎ শ্রদ্ধাদি সম্পন্ন করা হত। যেমন ধনপতির পিতার মৃত্যুতে—

"কাল পরিপূর্ন্ন হইল জয়পতি মৈল॥
জ্ঞাতি গোত্র ধনপতি অনিল ডাকিয়া।
মৃতদাহন করে সাধু ভোমরাতে যাইয়া॥
এক মাসে মৃতা কার্য্য সমাধা করিয়া।
গৃহেত বসিল সাধু শোকাকুলি হৈয়া॥" (মানিক /১৮৫)

ব্যাধ সমাজেও মৃত্যুর পর মৃতদেহ দাহকরা হত।

উচ্চবর্ণের কুলীন হিন্দুসমাজে সতীদাহ প্রচলিত ছিল। সতীদাহ অনার্য-ব্যাধ সমাজেও প্রবেশ করে

গিয়েছিল বোধ হয়, তাই তো দেখি ধর্মকেতুর মৃত্যুর পর নিদয়া সহমরণে গমন করে। স্বামীর মৃত্যুর পর সদ্য বিধবাকে স্বামীর চিতায় পুড়িয়ে হত্যা করাই সতীদাহ। মধ্যযুগে অনেকক্ষেত্রেই স্ত্রীরা স্বামীর চিতায় ইচ্ছামৃত্যু গ্রহণ করত—

"কি করিব কোথা যাইব স্থির নহে মতি।
আমিহ পুড়িয়া মরিম প্রভুর সঙ্গতি॥
কংস নদীর তটে আছে বড় রম্য স্থল।
নানা কাষ্ঠ কুড়াইয়া জ্বালিল আনল॥
প্রদক্ষিণে অগ্নি দিল মুখের উপর।
মাও বাপ নমস্কারি বীর আইল ঘর॥" (দ্বিজ মাধব/৪২)

দ্বিজ রামদেবের কাব্যেও দেখি কালকেতুর পিতার মৃত্যুর পর তার জননী অনুমৃতা হয়েছে—

"তটিণীর তটে বীর হুতাশন জ্বালি।
পাবকে চড়াইয়া পিতার দেহ দিল তুলি॥
মৃত সহ অনুমৃতা গেল তার মাতা।
লোটাইয়া কান্দে কেতু হাহা মাতা পিতা॥" (দ্বিজ রামদেব/৫৩)

উচ্চবর্ণের সমাজে সতীদাহ আবশ্যিকভাবে পালিত হত। মৃত্যুর পরে যথাশাস্ত্র প্রেতকর্ম ও শ্রাদ্ধাদি করা বিধেয়। শ্রাদ্ধ ও ক্রিয়াকর্মে পুরোহিত আবশ্যক হত। কালকেতু পুরোহিতের ব্যবস্থায় পিতামাতার ক্রিয়াকর্ম, শ্রাদ্ধাদি, তর্পণ সকল-ই সম্পন্ন করে—

"সেই কালে কালকেতু লইয়া পুরোহিত।
জননীজনকের করে ঔর্দ্ধদেহিক॥
প্রেতকর্ম্ম সঙ্কলিআ ব্যাধের নন্দন।
করুণা বিলাপে কান্দে বসিআ তখন॥" (ঐ)

স্বামীর মৃত্যুর পর সদ্যবিধবার হাতের শাঁখা ভেঙে, সিঁথির সিন্দুর মুছে দেওয়া হত এবং হাতে আম্রডাল দেওয়া হত। অনুমৃতা হতে ইচ্ছুক নারীকে শেষবারের মত সিন্দুর পরানো হত—

"সুন্দর সিন্দুর ভালে চুরুণী কুন্তলজালে।
সঘনে নাড়য়ে আম্রডাল॥"(মুকুন্দ/১৭)[৯৬]

ধর্মকেতুর মৃত্যুর পরেও নিদয়া আম্রডাল ধারণ করেছিল—

"পুত্রের বচনে রামা বাহিরায় তৎকাল।
শোকে ব্যাকুল হ'য়া ভাঙ্গে চূত ডাল॥"(দ্বিজ মাধব/৪২)

হিন্দু বাঙালীর মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধাদি অত্যন্ত আবশ্যকভাবে পালিত হত। শ্রাদ্ধকর্ম না হলে মৃতের আত্মার সদ্‌গতি হয় না এবং শুধু তাই নয়, তার গৃহে পড়শী, আত্মীয়-কুটুম্বাদি জলগ্রহণ করে না। ধনপতির পিতার মৃত্যু হলে ধনপতির অনুপস্থিতির জন্য এক বৎসর কাল শ্রাদ্ধাদি হয়নি। সুতরাং পুরোহিত এক বৎসর পর শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা দেয়—

"পিঞ্জর গড়াতে গেলা করিয়া পাশার খেলা
একবর্ষ গোঙাইলে তথা।
বৎসর তোমার বাসে জ্ঞাতি বন্ধু নাহি আসে
ইথে নাহি কহ কোন কথা।
. . . . . .

আমি তব পুরোহিত অনুক্ষণ চাহি হিত
পিতৃকার্য্যে দেহ ভায়া মন।" (মুকুন্দ/১৩৯)[৯৭]

ধনী ব্যাক্তিরা শ্রাদ্ধকালে ব্রাহ্মণ, ভাট, পুরোহিতকে অন্ন, বস্ত্র, সুবর্ণ দান করত এবং জ্ঞাতি ভোজন করিয়ে শ্রাদ্ধ সমাপ্ত হত—

যথাবিধি পিণ্ডদান শ্রাদ্ধ করি সমাধান
ব্রাহ্মণেরে করে বহুমান।
. . . . . .
চন্দন কুসুম মালা ভরিয়া কনক থালা
সাধু চলে বান্ধব পূজনে॥" (ঐ/১৪০)[৯৮]

মধ্যযুগীয় বাঙালী সমাজে সন্ন্যাসী, ওঝা, গণৎকার, দৈবজ্ঞ, ঘটকদের প্রতি বাঙালীর এক জাতীয় বিশ্বাস ছিল। অদৃষ্টবাদী বাঙালী দৈবজ্ঞের কথা ও গণৎকারের গণনায় বিশ্বাস করত। সাধু-সন্ন্যাসীদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভক্তি করত, ফলে দেখা যায় দেবদেবীরা বারবার ছদ্মবেশ ধারণ করেছে; তারা কখনো বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, কখনো দৈবজ্ঞের ছদ্মবেশ ধারণ করে সাধারণ মানুষকে প্রতারণা করেছে। সহজ সরল বাঙালীর দুর্বলতর এই বিশ্বাসের দিকটি মঙ্গলকাব্যে আছে।সন্তানের জন্মকালে দৈবজ্ঞ বা গণৎকারেরা ভাগ্য গণনা করত, কোষ্ঠী রচনা করত।সে সবের প্রতিও মানুষের বিশ্বাস ছিল—

"দুর্ব্বলা গণক জনে সম্ভ্রমে ডাকিয়া আনে
দেখে তারা দীপিকা ভাস্বতী।
পুরোধা পণ্ডিত জন অবধানে দেই মন
দেখে তারা শিশুর জাওয়াতি॥"(ঐ/১৬৭)[৯৯]

তাছাড়া যাত্রাকালে শুভাশুভ নির্ণয় করত দৈবজ্ঞ পণ্ডিত ও গণৎকাররা। স্বর্গের দেবদেবীগণও এই সংস্কারের বাইরে নয়। স্বর্গে দেবী চণ্ডী নানা রকম কু-লক্ষণ দেখে সখী পদ্মাবতীকে গণনা করার নির্দেশ দেয়—

"বিচার করিঞা পাইল নগর উজানি।
সাধুর রমনী পূজে সুন্দর খুলুনি॥"(মানিক /২৬৩)

মশানে শ্রীমন্ত দেবীকে স্মরণ করলে দেবীর বাম অঙ্গ কম্পিত হয়, সখী পদ্মাবতী পাঁজি-পোথা নিয়ে খড়ি পেতে গণনা করে জানতে পারে শ্রীমন্ত দেবীকে স্মরণ করেছে—

"মর্ত্ত্য-মণ্ডল গণি খড়িতে দিল রেখ।
শ্রীয়মন্তের খড়িতে পাইল প্রত্যেক॥" (দ্বিজ মাধব/২৬৮)

জ্যোতিষ, পাঁজি এসবে বাঙালীর অটুট বিশ্বাস ছিল।দৈবজ্ঞ বা গণৎকাররা পাঁজি-পুথি দেখে দিনক্ষণ নির্ণয় করত।ধনপতির পিতৃশ্রাদ্ধের সময় পুরোহিত ঠাকুর পাঁজি দেখে শ্রাদ্ধের সময় নির্ধারণ করেছিল-

"কি কর কি কর ভায়া পাঁজি দেখি আইনু ধায়া।
শুনহ আমার নিবেদন।
এই সিত ত্রয়োদশী খুড়া হইলা স্বর্গবাসী
বলিবারে তার প্রয়োজন॥" (মুকুন্দ/১৩৯)[১০০]

বিবাহকালে ওঝা দৈবজ্ঞ বা গণৎকাররা বিবাহের শুভলগ্ন নির্ধারণ করত—

"নিবেদয়ে দ্বিজ তারে নিজ প্রয়োজন॥
গ্রহ ওঝা করে মেষরাশির কল্যাণ।

সভা বিদ্যমানে ওঝা পড়ে পাঁজিখান॥" (ঐ/৯৮)[১০১]

অনার্য-ব্যাধ বা নিম্নবর্ণের হিন্দুসমাজেও ব্রাহ্মণ, দৈবজ্ঞ পণ্ডিতদের প্রভাব ছিল; কালকেতুর বিবাহে সোমাই ওঝা দিন নির্ণয় করে লগ্ন স্থির করে—

সঞ্জয়কেতুর ঘরে উত্তরিল দ্বিজ।
বন্দিলা সঞ্জয় তার পদ-সরসিজ ।" (ঐ/৩৭)[১০২]

দ্বিজ রামদেবের কাব্যেও মধ্যযুগীয় সমাজের এই প্রবণতাগুলি লক্ষ করা যায়। কালের ব্যবধানে রচিত হলেও বাঙালী সমাজে এই বিশ্বাস-সংস্কারের খুব রদবদল ঘটেনি। তবে সময়ের পরিবর্তনে দৈবজ্ঞ বা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের প্রতি ধীরে ধীরে মানুষের শ্রদ্ধাবোধ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।দ্বিজ মাধবের কাব্যেই আমরা দেখি দৈবজ্ঞের গণনাকে ধনপতি উপেক্ষা করেছে—

"ধনপতি বোলে গণক মিথ্যা কহ যে।
হর বিনে ভাল মন্দ বলিতে পারে কে॥ (দ্বিজ মাধব/২০০)

নিম্নশ্রেণীর বাঙালী সমাজেও দৈবজ্ঞ, গণৎকার বা ব্রাহ্মণের প্রতি বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। বিবাহ বা শুভ উৎসবে দিনক্ষণ নির্ণয় বা আয়োজন করার সময় সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিকে ডাকার প্রয়োজন হত, সেখানে লোভী ব্রাহ্মণের সঙ্গে জ্ঞাতিবর্গের বিবাদ নিশ্চিত ছিল—

"আসিয়াছে জ্ঞাতিগণ হইয়া সানন্দিত মন
তা সভারে দেয়গী আসন।
বিপ্রের আদেশ পাইআ পুষ্পকেতু আসি ধাইআ
বসাইল জ্ঞাতি সমুদিত।
সেই সভাএ জ্ঞাতি সাথে বচনে বিবাদ পাতে
গণ্ডিশর এড়িয়া ভূমিত॥
ব্যাধ বোলে বিপ্র মনা মনে ছাড় সে বাসনা
মোর বাক্য না ভাবিঅ আন।
বসুপণ কবর্দ্দ এক দুইখানি খইয়া লেক
তবে সে ফুলরা দিমু দান॥" (দ্বিজ রামদেব/৫০)

সপ্তদশ শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ, ওঝা ও গণৎকারের প্রতি মানুষের বিশ্বাস কতটা কমে গিয়েছিল তার দৃষ্টান্ত পাই রামদেবের কাব্যে। কালকেতুর বিবাহের শেষে ব্রাহ্মণের দান-দক্ষিণা নিয়ে বিবাদ সৃষ্টি হয়, সুতরাং—

"কর্ম্ম সাঙ্গ দান মাগে ব্রাহ্মণ রুষিল।
এহার কারণে বিপ্র খাইল কত কিল॥
বোলাবুলি ঠেলাঠেলি কত কটু বাণী।
বিবাদ করিল বিপ্র সমস্ত যামিনী॥" (ঐ /৫১)

ভাব-কেন্দ্রিক উপাদান ঃ মঙ্গলকাব্যে বাঙালীর সামাজিক ইতিহাসের আর একটি উপকরণ হল ভাব-কেন্দ্রিক উপকরণ অর্থাৎ শিক্ষা-সংস্কৃতি। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে আমরা মধ্যযুগের বাঙালীর শিক্ষা-সংস্কৃতির পরিচয় পাই। মধ্যযুগে বাংলার শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল ধনী ব্যক্তিদের প্রচেষ্টায়। এই পর্বের শিক্ষাব্যবস্থা ছিল টোল-কেন্দ্রিক। টোল বা পাঠশালাগুলিতে শিশুরা শিক্ষালাভ করত। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে আমরা এই শিক্ষাব্যবস্থার পরিচয় পাই এবং সেকালে কি কি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হত তার বিবরণ পাই। সেকালে মূলত বর্ণপরিচয়, ব্যাকরণ, অভিধান, শাস্ত্রগ্রন্থাদি পাঠ করানো হত। মানিক দত্তের কাব্যে শ্রীমন্ত গুরুমশায়ের পাঠশালায় পড়ত, তার

পাঠ্য বিষয়গুলি নিম্নরূপ—

"ক খ পড়েন সাধু গুরুর মন্দিরে।
বার ফলা পড়ি সাধু শাস্ত্রপাট করে॥
পিঙ্গল পড়িল আর পড়িল সুবন্ত।
অভিধান পড়িয়া শব্দের পাল্য অন্ত॥" (মানিক/২৮৬-২৮৭)

দ্বিজ মাধবের কাব্যে শ্রীমন্ত সরস্বতীপূজা করে পাঠ আরম্ভ করেছে; সে বর্ণমালা ও ব্যাকরণের পাঠ গ্রহণ করে—

"পুণ্য তিথি গুরুবারে কঠিনী লইয়া করে
পূজা করিয়া সরস্বতী॥
'ক'-বর্গ যে পঞ্চাক্ষর লেখি দিল ক্ষিতি-তল
প্রতি অক্ষর জানায়ে জনার্দ্দন।
. . . . . .
ষত্ব ণত্ব জ্ঞান হয়ে সংস্কৃতে কথা কহে
পারগ হইল ব্যাকরণ॥" (দ্বিজ মাধব/২১৭-১৮)

মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যে দেখি শ্রীমন্তের নানা বিদ্যাশিক্ষার আয়োজন আছে, সেখানে পাঠ্য বিষয়গুলি হল— শাস্ত্র, দর্শন, ব্যাকরণ, টীকা, কোষ, নাটিকা, ছন্দ, অলঙ্কার, কাব্যতত্ব, সাহিত্যদর্পণ, বৈদ্যবিদ্যা, জ্যোতিষ ইত্যাদি। ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে সুস্থিত বাংলার রাজনৈতিক পটভূমিতে নানা বিদ্যার্চচার দুয়ার খুলে গিয়েছিল তা বোঝা যায় এই বিবরণ থেকে। মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যে শ্রীমন্ত যে সমস্ত বিষয়ে পাঠ গ্রহণ করে তার বিবরণ নিম্নরূপ—

"পড়য়ে শ্রীপতি দত্ত বুঝায়ে শাস্ত্রের তত্ত্ব
রাত্রি দিন করিয়া ভাবনা।
. . . . . .
বৈদ্যক জ্যোতিষ যত বিশেষ বলিব কত
একে একে পড়িল শ্রীপতি।"(মুকুন্দ/১৭১)[১০৩]

অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত দ্বিজ রামদেবের কাব্যেও শ্রীমন্তকে ঐ বিষয়গুলি পাঠগ্রহণ করতে দেখা যায়—

"কবর্গাদি লিখে যত বিশেষ চিনএ কত
ফিরি ফিরি পঠে খানি খানি।
. . . . . .
দ্বাদশ বৎসর শিশু গুরুমুখে পাইয়া কিছু
শাস্ত্রেতে সাগর হএ পার॥"(দ্বিজ রামদেব/২৯৯)

সাধারণত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা শিক্ষা দিত। অনেকক্ষেত্রেই পণ্ডিতরা নিজেরা টোল খুলে পড়াত, তবে কখনো ধনী ব্যক্তির গৃহের আটচালায় বা চণ্ডীমণ্ডপে পাঠশালা চালাত। শিক্ষক পণ্ডিতরা পাঠদানের বিনিময়ে অর্থমূল্য কিংবা মোহর পেত—

"লেখিঞা সুন্দর কৈল সকল অক্ষর।
পণ্ডিতে দক্ষিনা দিল সোবন্ন মোহর॥" (মানিক/২৮৭)

সেকালে গুরু-শিষ্য সম্পর্ক ভাল থাকলেও যে সব সময় ভাল ছিল তা নয়। অনেক সময়ই গুরু-শিষ্য সম্পর্কে তিক্ততা দেখা দিত— শ্রীমন্তের পাঠশালার বিবরণ থেকে তা জানতে পারি।সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষা বিষয়ে খুব আগ্রহ ছিল না। নিম্নশ্রেণীর বাঙালী ও দরিদ্রদের মধ্যে শিক্ষার তেমন চল ছিল না, তবে ধনী বা অবস্থাপন্নরা

শিক্ষার প্রতি আগ্রহ দেখাত—

"মুক্ষ হঞা বাড়ে পুত্র সাধু নাই ঘরে।
সাধু আসিঞা মন্দ বলিবে আমারে॥
দুবলা ডাকিয়া আনে পণ্ডিত শ্রীহরি।
শুভক্ষণ গনিঞা ছ্যালাকে দিল খড়ি॥" (ঐ /২৮৬)

মুকুন্দের কাব্যে খুল্লনা ছেলেকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য পণ্ডিতমশাই নিযুক্ত করে—

"আচার বিনয় দীক্ষা যত্নে করাইবে শিক্ষা
যাক ছিরা তোমার নিলয়॥
দ্বিজ শ্রীমন্তের করহ কল্যাণ।
যত চাহ দিব ধন নিবিষ্ট করাও মন
সুতে মোর দেহ বিদ্যাদান।" (মুকুন্দ/১৭০)

নারীশিক্ষার খুব একটা চল না থাকলেও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে নারীশিক্ষার প্রসঙ্গ দেখা যায়। দ্বিজ মাধবের চণ্ডীমঙ্গলে ব্রাহ্মণী, লীলাবতী, খুল্লনা এ সমস্ত নারীরা লেখাপড়া জানে। লহনা তার সই ব্রাহ্মণীকে ধনপতির নামে মিথ্যা পত্র লিখতে অনুরোধ করেছে এবং ব্রাহ্মণী মিথ্যা পত্র লিখে দিয়েছে-

"ধর্ম্ম সাক্ষী করি রামা কলম ধরিল।
পত্র মসালী লইয়া লেখিতে লাগিল।"(দ্বিজ মাধব/১৩৭)

মুকুন্দের কাব্যে লীলাবতীও লেখাপড়া জানে, তাই সে লহনাকে মিথ্যা পত্র লিখে দিয়েছে। লীলাবতী লহনাকে বলেছে তাদের নামের প্রথম অক্ষরে মিল আছে, সুতরাং তারা পরস্পর সখী হয়—

"জীবন যৌবনে আর বড়ই পীরিত।
আদির অক্ষরে দেখি দুইজনে মিত॥" (মুকুন্দ/১১০)[১০৪]

লীলাবতীর পত্র রচনা সেকালের পত্ররীতির একটা উদাহরণ হতে পারে। খুল্লনাও শিক্ষিতা রমণী, সে ধনপতির অক্ষর ও অন্যের অক্ষরের পার্থক্য বুঝতে পারে—

"লহনার বচনে খুল্লনা পড়ে পাতি।
হাসয়ে খুল্লনা ছন্দ দেখি ভিন্ন ভাতি॥
খুল্লনা বলেন দিদি নাহি গো তরাস।
কে মোরে লিখিয়া পাতি করে উপহাস।
প্রভুর অক্ষর নহে দেখি ভিন্ন ছন্দ।
কেবা এ লিখিল পত্র করিয়া প্রবন্ধ॥" (ঐ)[১০৫]

শিক্ষার উপকরণ হিসাবে সেকালে তালপাতা ব্যবহার করা হত। কাগজের প্রচলন হয়নি কিন্তু তুলট কাগজের ব্যবহার ছিল, তাছাড়া কলম, খড়ি, মসী, মসীপাত্র ইত্যাদি ব্যবহৃত হত।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বাঙালীর মধ্যযুগীয় সংস্কৃতির পরিচয় আছে। মধ্যযুগের বাঙালীর শিক্ষাদীক্ষা, ধ্যান-মননের প্রকাশ আছে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে।ব্রতকথার দেবী চণ্ডী মঙ্গলচণ্ডীতে রুপান্তরিত হল এবং বৃহৎ সমাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মঙ্গলকাব্যের দেবীতে পরিণত হল। বাংলার বার-ব্রত, পালাপার্বণ ধর্ম-কর্ম, বোধ-বুদ্ধি সমস্ত কিছু নিয়ে কবির লেখনীতে আত্মপ্রকাশ করল। কবিগণ উপাস্য দেবীর মাহাত্ম্যকথা বলতে গিয়ে দেবীকে যেমন মানবী করে তুলেছেন তেমনি দেবকথা বলতে গিয়ে মধ্যযুগীয় বাঙালীর কথাকে তুলে ধরেছেন। বাঙালীর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নানান আচার পালিত হত, এর মধ্যে বাঙালীর নিজস্ব সৌন্দর্য ও শিল্পবোধ প্রকাশিত।বাঙালীর শিল্পকর্ম,

সজ্জারীতি, আলপনা অঙ্কন, পূজা-পার্বণ, বার-ব্রত ইত্যাদির মোটামুটি পরিচয় আছে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে। বাঙালীর বারো মাসে তেরো পার্বণের অন্যতম হল দুর্গাপূজা। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে দুর্গাপূজা বাঙালী সমাজে প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল। মানিক দত্তের কাব্যে আমরা দুর্গাপূজার উল্লেখ পাই, যেমন—

"আশ্বিন মাসেত নরে পূজে দশভুজা।" (মানিক /৯৮)

মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যে অম্বিকা পূজার কথা পাই; পূজা উপলক্ষে বলিদান করা হত, লোকে উত্তম বসন পরিধান করত, উত্তম আহার করত। কবির বর্ণনায়—

"আশ্বিনে অম্বিকা-পূজা করে জগজনে।
ছাগল মহিষ মেষ দিয়া বলিদানে॥
উত্তম বসনে বেশ করয়ে বনিতা।" (মুকুন্দ/৫৪)[১০৬]

দোল রঙের উৎসব, বাঙালী সংস্কৃতির একটি বিশেষ পর্ব। এই সময় লোকে রঙের খেলায় মেতে উঠত। তাছাড়া শিবের গাজন বাঙালীর একটি বিশিষ্ট উৎসব। শিবের গাজন উপলক্ষে ভক্তরা পিঠে বা জিহ্বায় কাঁটা ফুটিয়ে চড়ক করত, মুকুন্দ তার বর্ণনা দিয়েছেন—

"চৈত্রমাসে শিব পূজে নানা উপচারে।
ঢাক ঢোল বাদ্য বাজে শিবের মন্দিরে॥
জিহ্বা ফোঁড়ে জিহ্বা কাটে করয়ে চড়ক।
অভিমত স্বর্গে যায়, না যায় নরক॥" (ঐ/২৮)[১০৭]

বাঙালী সমাজে মধ্যযুগেই কৃষ্ণকথা, নানা ধরনের দেবকথা পালাগান আকারে গীত হত। সুশীলা ও সখীগণ মিলে শ্রীমন্তকে কৃষ্ণলীলা শোনাতে চেয়েছে—

"ফাগু দোল করিয়া গোঁয়াব নিত নিত॥
সখী মেলি গাব গীত সখী মেলি গাব গীত।
আনন্দিত হয়ে সবে কৃষ্ণের চরিত॥" (ঐ/২২৫)[১০৮]

বাক্-কেন্দ্রিক উপাদান ঃ বাক্-কেন্দ্রিক উপাদানগুলির মধ্যে প্রধান প্রবাদ-প্রবচন। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে উল্লিখিত প্রবাদ-প্রবচনগুলির কথা উল্লেখ করা হচ্ছে। যেমন- মানিক দত্তের কাব্যে ব্যবহৃত প্রবাদ-প্রবচন —

১। "পুরুষ বিনা নারীর যৌবন মরা।
চন্দ্র বিনা উজ্জ্বল করিতে নারে তারা॥
২। পীপীড়ার পাখা হয়ে মরিবার তরে।
৩। ঠগঠামন হৈতে অনেক কর্ম্ম হয়ে।

দ্বিজ মাধবের কাব্যে ব্যবহৃত প্রবাদ-প্রবচন —

১। ব্রাহ্মণের বাক্য আমি নারি খণ্ডাইবারে।
২। সৎপন্থেতে থাকিলে আপদ নহে তার।
৩। বিধির নির্বন্ধ কভো না যায় খণ্ডন।
৪। বামন হইয়া বীরবর চান্দোরে বাড়াও কর।
এহা তোমার উচিত না হয়ে।
৫। দৈবের নির্ব্বন্ধ তান না যায়ে খণ্ডন।
৬। পতি গুরুজন সেই যে আপন
জিজ্ঞাসিয়া চাহ সর্ব্বজন।

৭। মিথ্যা বচন জান জলের তিলক।

৮। পতি ছাড়ি গতি নাই স্ত্রীধর্ম হৈয়া।

মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যে ব্যবহৃত প্রবাদ-প্রবচন —

১। স্বামী বনিতার পতি স্বামী বনিতার গতি
স্বামী বনিতার বিধাতা।

২। পিপীড়ায় পাখা উঠে মরিবার তরে।

৩। নফরের হাতে খাঁড়া বহুড়ি জনের ভাড়া
পরিণামে দেয় বড় দুঃখ।

৪। খর্ব হইআ ধরিবারে চাহ দ্বিজরাজ।

৫। আপনি রাখিলে রহে আপনার মান।

৬। নীচ কি উত্তম হবে পাইলে বহুধন।

৭। প্রজা নাহি মানে বেটা আপনি মণ্ডল।

৮। জনম হইলে হয় অবশ্য মরণ।

৯। দুগ্ধ দিয়া কি কারণে পোষ কালসাপ।

১০। শুখানের মৎস আর নারীর যৌবন।
ত্রিপান্তরে পায় যদি রজত কাঞ্চন॥

দ্বিজ রামদেবের কাব্যে ব্যবহৃত প্রবাদ-প্রবচন —

১। না জানিয়া বিষবৃক্ষ করিছি বপন
আপনে রোপিয়া কেহো না করে ছেদন।

২। বীর কোলে দুঃখ সুখ কর্মের অধীন।

৩। পুরুষ কঠিন জাতি হীরার কাঠারী॥

৪। জনম লভিলে তবে অবশ্য মরণ।

৫। সুখ দুঃখ যত হয়ে কর্মের অধীন।

এই প্রবাদ-প্রবচনগুলির মধ্যে দিয়ে মধ্যযুগের সামাজিক আদর্শ, ন্যায়বোধ, নৈতিকতা, মানব চরিত্র ইত্যাদি সম্পর্কে কবির অভিজ্ঞতা প্রকাশ পায়। আবার প্রতিটি যুগের পৃথক আদর্শবোধ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা যায়।চণ্ডীমঙ্গলে ব্যবহৃত প্রবাদ-প্রবচনগুলিতে প্রায় একই রকম সামাজিক আদর্শ প্রকাশিত। এখানে কবি একই কথা একটু ভিন্ন ভাষাতে প্রকাশ করেছেন মাত্র, সুতরাং বোঝা যায় প্রবাদগুলি প্রায় সমসাময়িক সমাজ ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে রচিত। প্রবাদ-প্রবচন ছাড়া মধ্যযুগের বাংলা ভাষায় কতকগুলি বিশিষ্ট বাক্‌রীতি আছে এবং এগুলি চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে আছে। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, যুগের পরিবর্তনে কিছু কিছু বাক্‌রীতি পরিবর্তিত হয়েছে এবং সেখানে নতুন বাক্‌ভঙ্গীর সৃষ্টি হয়েছে। বাক্-কেন্দ্রিক উপাদানগুলিতে ধাঁধাঁ একটি বিশিষ্ট প্রয়োগ। বাঙালী কথাবার্তায় প্রচুর ধাঁধাঁ বা হেঁয়ালি ব্যবহার করত। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে এজাতীয় ধাঁধাঁর ব্যবহার আছে, এগুলিতে বাঙালীর চিরন্তন জীবন বৈশিষ্টের পরিচয় আছে। সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এর বাইরের রূপের পরিবর্তন ঘটে গেলেও আচারগতক্ষেত্রে সমাজ ইতিহাসে এর ব্যবহারগত তাৎপর্য আছে। মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে এজাতীয় ধাঁধাঁর ব্যবহার আছে. যেমন—

"রাত্রে জনম জার দিবসে মরন।
জার ঘরে জন্মে তাকে করাএ ক্রন্দন॥

. . . . . .

সাগরে জনম তার নগরে বিকায়।

জন্ম অবধি তাকে নাই ছত্র মাএ ॥

শুন ২ পণ্ডিত কথা অদ্‌ভূত।

মাএ ছোইলে তার মরি জায় পুত ॥" (মানিক/২১৭-২১৮)

মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যেও এজাতীয় ধাঁধাঁর ব্যবহার আছে। শুকপাখি এসব ধাঁধাঁ বলেছে আর পণ্ডিতরা তার মীমাংসা করেছে, যেমন—

"বিধাতা-নির্ম্মিত ঘর নাহিক দুয়ার।

যোগেন্দ্র পুরুষ তায় আছে নিবাহারে ॥

যখন পুরুষবর হয় বলবান।

বিধাতার ঘর ভাঙ্গি করে খান খান ॥

. . . . . .

জন্ম হৈতে গাছ বায় রুধির ভক্ষণ।

দুই জনে জড় হৈলে অবশ্য মরণ।

মরণ সময়ে নর ছাড়ে হুহুঙ্কার।

শ্রীকবিকঙ্কণ গান হিঁয়ালির সার ॥" (মুকুন্দ/১০৩-১০৪)[১০৯]

মঙ্গলকাব্যে লোকসাহিত্যের উপকরণ হিসাবে ছড়ার ব্যবহারও আছে। ঘুমপাড়ানি ছড়া, ছেলেভুলানো ছড়া চিরকাল বাঙালী জননী ও সন্তানের হৃদয়ে কল্পনার পাল তুলে দিয়েছে। ছড়া শুনিয়ে মা কখনো ছেলেকে ঘুম পাড়াচ্ছে, কখনো বা দুরন্ত ছেলেকে ভোলাচ্ছে— এসব লোকায়ত ছড়ার মধ্যে দিয়ে লোকজীবনের প্রকাশ ঘটেছে। পরিবর্তিত সমাজে ছড়ার বিষয়গত পরিবর্তনও ঘটেছে নিঃশব্দে। মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যে জননী খুল্লনা শ্রীমন্তকে ঘুম পাড়িয়েছে এই ছড়াটি শুনিয়ে—

"আয় আয়রে বাছা আয়।

কি লাগিয়া কান্দ বাছা কি ধন চায় ॥

আনিব তুলিয়ে গগনফুল।

একৈক ফুলের লক্ষৈক মূল।

সে ফুল গাঁথিয়া পরাব হার।

সোনার বাছা কেঁদোনা আর ॥

খাওয়াব ক্ষীরখণ্ড মাখাব চুয়া।

কর্পূর পাকা পান সরস গুয়া ॥

রথ গজ ঘোড়া কৌতুক দিয়া।

বাজার দুহিতা করাব বিয়া ॥

শ্রীমন্ত চাপে মোর বিনোদ নায়।

কুঙ্কুম কস্তরী মাখাব গায় ॥

পালঙ্কে নিদ্রা যাবে চামর বায়।

শ্রীকবিকঙ্কণ সঙ্গীত গায় ॥" (ঐ/১৬৮)[১১০]

এই ঘুমপাড়ানি ছড়াটির মধ্যে সেকালের সমাজ ইতিহাসের বহু ক্ষুদ্র উপকরণ ছড়িয়ে আছে তা অস্বীকার করা যায় না।

ক্রীড়া ও শরীরচর্চা-কেন্দ্রিক উপাদান ঃ অতঃপর ক্রীড়া ও শরীরচর্চা-কেন্দ্রিক উপাদানের কথায় আসি। বাংলার লোকসমাজে অজস্র লোকক্রীড়া ছড়িয়ে আছে। মঙ্গলকাব্যে সামান্য হলেও কিছু কিছু লোকক্রীড়ার ব্যবহার আছে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেও কিছু কিছু লোকক্রীড়ার উল্লেখ পাই । এই সমস্ত লোকক্রীড়ার বিনোদনগত, শরীরচর্চাগত অর্থাৎ ব্যবহারগত মূল্য আছে। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত লোকক্রীড়ার একটা সাধারণ পরিচয় এখানে আছে। মানিক দত্তের কাব্যে পাই—

"নগরিয়া লোকের সঙ্গে করিছে খেলা।"(মানিক/৬৪)

খেলার বিবরণ কবি দেননি। কবিকঙ্কণ শ্রীমন্তের বাল্যক্রীড়ার বিবরণ দিয়েছেন তা থেকে সেকালে প্রচলিত লোকক্রীড়াসমূহের নাম জানতে পারি যেমন—

"নগরিয়া শিশু সঙ্গে খেলা করি ফিরে রঙ্গে
খেলে চিকা গুলি দাঁড়া ভাটা।
পাশাতে হইয়া বশ ডাকে সদা দশ দশ
বিপঞ্চিকা খেলায় শকটা॥
পাতি খেলে বাঘ চালু জুয়া খেলে কুলিকুলি
সামরুল শুনাইতে কথা।
কোলে কোলে নেত্রবন্ধ খেলিতে সদাই দ্বন্দ্ব
না জানি দিবসে থাকে কোথা॥
ঝালি খেলে চড়ি গাছে জলে খেলে হয়ে মাছ
জীবন মরণ নাহি গণে।" (মুকুন্দ/১৭০)[১১১]

চিকা, গুলিদাঁড়া বা ডাণ্ডাগুলি , ভাটা , পাশা, শকটা, বিপঞ্চিকা, বাঘচালি, নেত্রবন্ধ বা কানামাছি, ঝালি, জলমাছ ইত্যাদি খেলার কথা এখানে আছে। শিশুদের ঐ সমস্ত ক্রীড়া ছাড়াও আছে বাটুল খেলা; বাটুলে গুলতি দিয়ে পশুপাখি হত্যা শিশুদের মজার ক্রীড়া। শিশুদের ক্রীড়া ছাড়া আছে বড়দের পাশাখেলার কথা। স্ত্রীপুরুষ একত্রে ঘরে বসে পাশা খেলা হত। গৌরী ও পদ্মাবতীর পাশা খেলার প্রসঙ্গ পাই চণ্ডীমঙ্গলে—

"কালি রাঙ্গি পাশা সারি আনিলা পার্ব্বতী।
আপনি দিলেন রাঙ্গি কালি পদ্মাবতী।
হাতে পাষ্টি করিয়া ডাকেন দশদশ।
এ কালে মেনকা আসি করিল বিরস॥" (ঐ/২২)[১১২]

পায়রা ওড়ানো সেকালে অর্থশালী ব্যক্তিদের একটি বিশেষ ক্রীড়া। পায়রা ওড়ানোর প্রতিযোগিতার কথা আমরা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে পাই—

"সখা সঙ্গে ধনপতি আনন্দে পূর্ণিত মতি
পায়রা উড়ায় সদাগর।
ছাড়িয়া পাটের দোলা সবে করে পাখী-খেলা
পড়ে খসি ভূষণ অম্বর।
. . . . . .
পায়রা রাখিয়া যাতে উড়াইল পারাবতে
আগে আইলে তার হবে জয়॥" (ঐ/৯৪)[১১৩]

এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের আমোদপ্রমোদমূলক ক্রীড়া প্রচলিত ছিল বলে মনে করা যেতে পারে।

সামাজিক অবস্থা ঃ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের তিনটি ধারায় প্রধান কবিদের কাব্যে সমসাময়িক বাঙালী সমাজের একটা সামগ্রিক ছবি দেখতে পাওয়া যায়। সমাজ ইতিহাসের বহিরাঙ্গিক উপাদানগুলিই নয়, এর মধ্যে সমাজ ইতিহাসের অন্তর্ধর্মের পরিচয় আছে। যদিও চণ্ডীমঙ্গল রচনার অন্তবর্তীকালে মনসামঙ্গল কাব্য রচনা হয়েছে, তবু লক্ষণীয় বিষয়, এসব মনসামঙ্গলের সঙ্গে চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী ধর্ম ব্যতিরেকে সমাজ চরিত্রের একটা সাযুজ্য চোখে পড়ে। অতঃপর আমরা চণ্ডীমঙ্গলে বর্ণিত অন্তরালবর্তী সমাজ ইতিহাসকে ধরার চেষ্টা করব।

বলাই বাহুল্য যে মধ্যযুগীয় সমাজ পুরুষশাসিত; নারী পরান্নজীবী, অসহায়; তারা জীবনের বিভিন্ন সময়ে পিতা, স্বামী ও পুত্রের অধীন। নারীসত্বা বিকাশের অবকাশ কোথাও ছিল না। কৌলীন্য প্রথা, বহুবিবাহ, সহমরণ প্রথা সমগ্র সমাজকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে আমরা বহুবিবাহের কবলে নারীর দুরবস্থার চিত্র পাই। ছদ্মবেশিনী দেবী চণ্ডী ফুল্লরাকে পরিচয় দিতে গিয়ে তার স্বামীর বহুবিবাহ অর্থাৎ তার সপত্নী সমস্যার কথা বলে। বস্তুত ধর্মকথার মোড়কে পরিবেশন করা হলেও এটাই ছিল সে সময়কার বাস্তব সত্য। ফলতঃ সপত্নী কলহে স্বামী সোহাগে কোন স্ত্রীর পাল্লা ভারী হত আর কেউ হত লাঞ্ছিতা। বস্তুত এই সকরুণ অবস্থা শুধুমাত্র গৌরীর নয় মধ্যযুগীয় কৌলীন্যশাসিত হিন্দুসমাজের। স্বামীর এই পক্ষপাতিত্ব গৌরীর মন্তব্য থেকে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে—

"কি কব দুঃখের কথা গঙ্গা নামে মোর সতা
স্বামী যারে ধরেন মস্তকে।" (ঐ/৫২)[১১৪]

ভ্রমরা জাতি পুরুষ নারীর কামনা-বাসনা বা চাওয়া-পাওয়াকে মূল্য দেয়নি বলেই বণিক খণ্ডে ধনপতি স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও খুল্লনাকে বিবাহ করে, শ্রীমন্ত সুশীলাকে বিবাহ করার পরেও আবার বিবাহ করে। বহুবিবাহের ফলে সপত্নী সমস্যা একটা জ্বলন্ত সমস্যায় পরিণত হয়। বাঙালী সমাজে দুই সতীনের সম্পর্ক কখনোই ভাল ছিল বলে মনে হয় না।তাইতো ফুল্লরাকে পরিচয় দিতে গিয়ে চণ্ডী বলেছিল-

"সাত সতিনীরা মারে বুঝিয়া না শাস্তি করে
সাত সতা পরাণের বৈরী।" (ঐ/৫২)

ফুল্লরাও দেবীকে তাই সতীন প্রতিরোধের জন্য ব্যবস্থা দিয়েছে তার চিন্তাভাবনা অনুসারে—

"সতিনে কোন্দল করে দ্বিগুণ শুনাবে তারে
কেন ঘর ছাড় হয়ে মানী।
কোপে কৈলে বিষপান আপনি ত্যাজিবা প্রাণ
সতিনের কিবা হবে হানি॥" (ঐ/৫৩)[১১৫]

বস্তুতপক্ষে, চণ্ডীমঙ্গলের বণিক খণ্ডের মূল সমস্যাই সপত্নী সমস্যার উপর দাঁড়িয়ে । এখানে বিগত যৌবনা পত্নী আর নবীনা পত্নীর অবস্থানগত দ্বন্দ্বকে চণ্ডীর মধ্যস্থতায় পরিবেশন করা হয়েছে। নিম্নবর্ণের অন্ত্যজ-ব্যাধ সমাজে পুরুষের বহুপত্নী গ্রহণের সমস্যা খুব একটা ছিল না। অন্তত ফুল্লরা-কালকেতু সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে একথাই বোঝা যায়। আসলে কৌলীন্যশাসিত সমাজে কুলীন পিতা কুল রক্ষার তাগিদে কন্যা রজঃস্বলা হবার আগেই পাত্রস্থ করার কথা ভাবত সুতরাং সপত্নী সমস্যার কথা মাথায় রেখেও কন্যা বহুপত্নীক পুরুষের হাতে দিতে দ্বিধা করত না। তই দেবীর উক্তি—

"দেখিয়া দারুণ সতাবিবাহ দিলেন পিতা
পিতৃকুলে হইনু বিমুখী॥"(ঐ/৫২)[১১৬]

মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থায় নারী সম্পর্কিত বিভিন্ন রকম সংস্কার— বাল্যবিবাহ বা গৌরীদান প্রথার ফলেও নারীকে সপত্নী সমস্যার যাতনা স্বীকার করতে হত।নারী সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের অনুশাসন প্রচলিত ছিল। চণ্ডীমঙ্গল

বণিক খণ্ডে লক্ষপতিকে ঘটক যে কথাগুলি বলেছে তা থেকে সে সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যেতে পারে। আবার পুরুষের বহুপত্নী গ্রহণও অনেক সময় সমাজ পরিবেশগত চাপের ফল। পুত্রহীন নারী ও পুরুষ সামাজিক দৃষ্টিতে আঁটকুড়া এবং অপয়া, সুতরাং তার মুখদর্শনও পাপ বলে বিবেচিত হত। মানিক দত্তের কাব্যে দেখি রাজা ধনপতিকে আঁটকুড়া বলে রাজসভায় প্রবেশ করতে বাধা দিয়েছে—

"আটকুড়া ধনপতি আছে নগর ভিতর।
তাহাকে পুরিতে য়াসিতে না দিহ সত্তর॥" (মানিক/১৯২)

সুতরাং ধনপতিকে সন্তানলাভের জন্য দ্বিতীয় বার বিবাহ করতে হয়েছিল। রাজার নির্দেশ ছিল—

"রাজা বলে শুনহ লক্ষের সদাগর।
দ্বিতীয় বিবাহ করি বংশ রক্ষা কর॥" (ঐ)

মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থায় পুরুষের নারী সম্পর্কিত মানসিকতা ছিল অস্বাভাবিক। সমাজ যেমন পুত্রহীনের মুখদর্শন করত না, তেমনি নারীকে পুত্রসন্তান উৎপাদনের যন্ত্র বলেই ভাবত। ধনপতির পুত্র না থাকায় সে নিজেকে অভাগ্য বলে গণ্য করে এবং রাজসভায় যেতে লজ্জা পায়। তবু তাকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে হয়েছিল। বিবাহের এগার বৎসরেও লহনা অপুত্রক থাকায় ধনপতি আবার স্ত্রী গ্রহণ করে। লহনার কাতরোক্তি—

"আর চারি বৎসর থাক প্রভু চিত্তে খেমা দিয়া।
না হয়ে লহনার ছাইলা করিহ দ্বিতীয় বিহা॥" (ঐ/১৯৩)

কিন্তু পুরুষ নারীর মানসিক কাতরোক্তির মূল্য দেয়নি। ধনপতি অপুত্রক স্ত্রীর কথা শুনতে রাজী নয়, কারণ লহনা 'বাঞ্ছি' বা বাঁজা।

মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থায় পরিবারে স্বামীস্ত্রীর সম্পর্ক ভাল ছিল না; অধিকাংশ বাঙালী পরিবারে স্বামীস্ত্রীর সম্পর্ক ছিল প্রভু-ভৃত্যের মত। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে পুরুষের নারী সম্পর্কিত এই মানসিকতার ছবি পাওয়া যায়। বস্তুত পক্ষে স্ত্রীরা ছিল সম্পূর্ণ স্বামীর অধীন, সুতরাং স্বামীই স্ত্রীর ধন, জন, বিধাতা ও দণ্ডদাতা। তাই স্বামী স্ত্রীর সামান্য দোষে নাক পর্যন্ত কেটে নিত। মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের এ সকল তথ্য পাওয়া যায়। ফুল্লরা চণ্ডীকে উপদেশ দিতে গিয়ে যে কথা বলেছে তা সামাজিক ইতিহাসে তাৎপর্যপূর্ণ—

"সন্তোষে বসায় খাটে দোষ দেখি নাক কাটে
দণ্ড রাজা বনিতার পতি॥" (মুকুন্দ/৫৩)[১১৭]

ফুল্লরার কথা মিথ্যা হলে কালকেতু ফুল্লরার নাক কেটে শাস্তি দিতে চেয়েছে—

"মিথ্যা হৈলে চিয়াড়ে কাটিব তোর নাসা॥" (ঐ/৫৫)[১১৮]

নারীকে সমাজের পৈশাচিক বিধানে নানাতর যন্ত্রনা সহ্য করতে হত। দ্বিজ রামদেবের কাব্যে নারীর প্রতি পুরুষের এই মানসিকতা সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে—

"পুরুষ কঠিন জাতি হীরার কাটারি।
একেতে মজিলে মন অন্য যায় ফিরি॥
অবলা অধম জাতি পদে পদে অপরাধ।
একেতে শরণ লইলে অন্যতে বিবাদ॥" (দ্বিজ রামদেব/১২৫)

পারিবারিক জীবনে স্ত্রীর ভালবাসা, সেবা পরায়ণতা সত্ত্বেও স্বামী স্ত্রীকে সহজেই প্রতারণা করত। রামদেবের কাব্যে ধনপতি সম্পর্কে লহনার মন্তব্যে তা স্পষ্ট হয়েছে—

"পতিজাতি অতিছাড় মরম না পাইলুম তার
বচনে ছলিল অভাগীরে॥" (ঐ/১২৪)

ধনপতি দ্বিতীয় বিবাহে লহনাকে কিভাবে ছলনা করেছিল তার বিস্তৃত পরিচয় আছে মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যে। অভিমানাহত লহনাকে ধনপতি প্রবোধ দেয়—

"রন্ধনের তরে তব করে দিব দাসী॥" (মুকুন্দ/৯৭)[১১৯]

কিন্তু ধনপতির কপট প্রবোধে লহনা ভোলেনি। তখন ধনপতি স্ত্রীর সম্পর্কে তার স্পষ্ট মানসিকতা জ্ঞাপন করে—

"স্ত্রী গত-যৌবনে পুরুষ নির্ধনে
কিবা আদবের চিন।' (ঐ/৯৭)[১২০]

তা সত্ত্বেও লহনাকে অর্থ, সোনা এবং কাপড়ের প্রলোভন দেখিয়ে ধনপতিকে দ্বিতীয় বিবাহে সম্মতি নিতে হয়। বাংলার নারীরা চিরকালই বস্ত্রালঙ্কারের বশীভূত, তাই প্রতারণা দ্বারা লহনাকে বশ করে সম্মতি আদায় করতে অসুবিধা হয়নি। মুকুন্দ চক্রবর্তী এসম্পর্কে লিখেছেন—

"পরিতোষে লহনাকে দিয়া পাটশাড়ী।
পাঁচ পল সোনা দিল গড়িবারে চুড়ি॥
সাধু বলে প্রিয়ে তুমি আছ মম মনে।
যেমন আছিলা পূর্ব্বের বিবাহের দিনে॥
রত্নপেয়ে যত্ন নিল লহনা যুবতী।
বিবাহের তরে তবে দিল অনুমতি॥ (ঐ/৯৮)[১২১]

নারীর অবস্থানগত হীনতার আরও একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হল গর্ভপত্র নেওয়া; বস্তুতপক্ষে হীন চরিত্র পুরুষ অনেক সময়ই নারীর উপর অর্থাৎ স্ত্রীর উপর আস্থা স্থাপন করত না, ফলে খুল্লনার ছয় মাস গর্ভাবস্থায় ধনপতির বিদেশ যাত্রাকালে গর্ভপত্র নিতে হয়েছে। কবিকঙ্কণের কাব্যে আছে—

"তোরে আশীর্ব্বাদ মোর পরম পীরিত।
সন্দেহ-ভঞ্জন-পত্র হইল লিখিত॥
যখন তোমার গর্ভ হৈল ছয় মাস।
হেনকালে নৃপাদেশে যাই পরবাস॥"(ঐ/১৫২)[১২২]

শুধু কি তাই, বাঙালী পরিবারের সকলেই ঘরের স্ত্রীর উপর অত্যাচার করত। মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যে ধনপতির বাণিজ্য যাত্রাকালে খুল্লনা বলেছে—

"মোর মনে লয় তথা হবে বহুকাল।
তোমার বান্ধব জন বিষম করাল॥
শঠতা করিয়া তারা যদি ধরে ছল।
সেই কালে কেবা মোর হবে অনুবল॥ (ঐ/১৫৬)[১২৩]

অনেক সময় সামান্য কারণে নারীর নানা রকম শাস্তি বিধান করা হত। খুল্লনাকে জ্ঞাতি বন্ধুজনের সম্মুখে নানা রকম অন্যায় পরীক্ষা দ্বারা সতীত্ব প্রমাণ করতে হয়েছে। কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীকে অনুমৃতা হতে হত। কেননা নারীর পিতার সম্পত্তিতে এবং স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামীর সম্পত্তিতে কোন অধিকার থাকত না, ফলে সহমরণে আত্মবিসর্জন ভিন্ন উপায় থাকত না। অবশ্য মুসলমান সমাজে এবং নিম্নবর্ণের হিন্দুসমাজে নারীর অধিকার ও মর্যাদা বোধ হয় অনেকখানি বেশী ছিল। পারিবারিক মর্যাদা নিয়ে ফুল্লরা স্বামী, শ্বশুর ও শ্বাশুড়ী সহকারে জীবন নির্বাহ করেছে। কালকেতু ফুল্লরাকে দিয়েছে সম্মান। কালকেতুর উক্তিতে নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শিত হয়েছে। ফুল্লরা ছদ্মবেশিনী দেবী চণ্ডী সম্পর্কে কালকেতুর চরিত্র নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করলে কালকেতু নারী সম্পর্কে যে দৃষ্টিভঙ্গি জ্ঞাপন করে তা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কালকেতু বলেছে—

"এ বোল শুনিয়া ক্রোধে বীর বোলে বাণী।
পরস্ত্রী দেখিয়ে যেন নিদয়া জননী॥" (ঐ/৫৫)

অবশ্য কালকেতুর মধ্যে দিয়ে কবি তার আদর্শ সমাজ, আদর্শ পরিবার গঠনের স্বপ্নকে রূপায়িত করতে চেয়েছেন। শাশুড়ী, ননদ ও সতীনের জ্বালায় বাঙালী ঘরের বধূর গৃহত্যাগ খুবই স্বাভাবিক ঘটনা ছিল। ছদ্মবেশিনী দেবী ফুল্লরাকে জানায় স্বামী ও সতীনের জ্বালায় সে গৃহত্যাগ করেছে, কথাটি অন্যভাবে ব্যক্ত হলেও তাতে সামাজিক সত্য নিহিত আছে। দেবী বলেছে—

"যে ঘরে সতিনী রয় হিংসানলে প্রাণ দ'য়
যেমন লাগয়ে বিষজ্বালা।
বিধি মোরে হৈল বাম না গণিনু পরিণাম
বনবাসী হইনু একেলা॥" (ঐ/ ৫২)

নারীর পক্ষে সতীনের ঘর করা কতখানি দুষ্কর ছিল তা বোঝা যায় দ্বিজ রামদেবের কাব্যে লহনার উক্তি থেকে। সতীন সম্ভাবনার কথা জেনে সে জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করতে চেয়েছে, কারণ স্বামী বিমুখ হলে নারীর দাঁড়াবার জায়গা থাকত না। লহনা বলেছে—

"ভগিনী সতার তাপনিশি দিশি হইল জাপ
ঝম্প দিমু জলধি মাঝারে।
দুবা কি বুদ্ধি বলিবা বোল আনি দেহ হলাহল
বঞ্চিতে নারিমু এই ঘরে॥
প্রাণনাথ হৈল বৈরী ছিড়িল প্রেমের দড়ি
কি বুঝি রহিতে বোল আর।
পুরুষ ভ্রমরাজাতি পাইল যুবতী অতি
কি আর যাইমু তার ঘর॥" (দ্বিজ রামদেব/১২৪)

এমন কি নারী এক রাত্রির জন্য পরগৃহে বসবাস করলে সমাজ তাকে গ্রহণ করত না, একারণে তার শাস্তি বিধান করা হত। ফুল্লরার উক্তিতে সমাজ মানসের এই দিকটি ফুটে উঠেছে—

"অধম অবলা জাতি যদি থাক এক রাতি
পরের ভবনে কদাচিত।
লোকে ব্যভিচারী বলে জ্ঞাতি বন্ধু ছল ধরে
অবিচারে কৈলা অনুচিত॥" (মুকুন্দ/৫৩)

দ্বিজ রামদেবের কাব্যে বাঙালী সমাজে সাধারণ পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের সুন্দর চিত্র পাই ফুল্লরার উক্তিতে। ফুল্লরা জানিয়েছে ক্ষুধার্ত স্বামী ফিরে এসে খেতে না পেলে তাকে প্রহার করবে—

"দিনান্তে আসিবে পতি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া।
শীঘ্র না পাইলে ভক্ষ্য মারিবে ধরিআ॥" (দ্বিজ রামদেব/৬৩)

এটাই ছিল বাস্তব চিত্র। মুকুন্দের কালকেতু-ফুল্লরার আদর্শ পরিবার চিত্র আদর্শায়িত বিষয়। মধ্যযুগীয় পারিবারিক আদর্শের কেন্দ্র স্বরূপ ছিল বধূ। তাকে নানা ত্যাগ স্বীকারের মধ্যে দিয়ে পারিবারিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হত, আর বধূর জীবনেই অঙ্কিত হত কলঙ্ক তিলক। তাই স্বামীগৃহে প্রেরণের আগে মা কন্যাকে নানা উপদেশ দিয়ে প্রেরণ করত। মানিক দত্তের কাব্যে খুল্লনাকে তার মা উপদেশ দিয়েছিল—

"রম্ভা কান্দিয়া বলে শুনহ খুলনা।

ভালমতে মানাইহ সতিন লহনা॥
ইষ্টমিত্র সাধুর আসিবে সর্ব্বজন।
তার আগে তুমি না ডাওাবে সর্ব্বক্ষণ॥
গৃহে বাসি কর্ম্ম করি স্নানকে যাইবে।
চতুর্দিগে দেখি তুমি স্নান করিবে॥
সকলিকে খাওাইহ করিয়া রন্ধন।
অবশেষে জেবা পায় করিহ ভোজন॥" (মানিক/২১১)

ব্যাধ কালকেতুর পারিবারিক জীবনেও কবি এই আদর্শের দৃষ্টান্তই স্থাপন করেছেন, তাইতো—

"নিদয়ার সুখ বড় বধূ গৃহ কর্ম্মে দড়
কুল যশ রক্ষণের হেতু॥" (মুকুন্দ/৩৯)[১২৪]

অথচ মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থায় পুরুষরা নারীকে যথার্থ সম্মান দেয়নি। মধ্যযুগীয় পুরুষ 'ভ্রমরা জাতি' বলে চিহ্নিত। মনসামঙ্গলে যে শিথিল চরিত্র পুরুষ সমাজের কথা পাওয়া যাচ্ছে চণ্ডীমঙ্গলে তারা অলস, অকর্মণ্য, ছিদ্রান্বেষী হলেও ততটা শিথিল চরিত্রবিশিষ্ট নয়।বোধ হয় চৈতন্য প্রভাবে সমাজে পুরুষ চরিত্র খানিকটা সংযত হয়েছিল। তাই এখানে ব্রাহ্মণ্যশাসিত সমাজের প্রতিভূ শিবঠাকুর ভিখারী ও অকর্মণ্য হলেও ইন্দ্রিয়লোলুপ নয়; আবার চাঁদ সদাগর চরিত্রের নারী আসক্তি ধনপতি বা কালকেতুর চরিত্রে নেই। কিন্তু পুরুষের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটেনি। বস্তুতপক্ষে, পুরুষশাসিত সমাজ চিরদিন নারীকে অবদমিত করে রেখেছিল। কুলীন পিতা বৃদ্ধ-অন্ধ-অশক্ত পাত্রের হাতে কন্যা সমর্পণ করত— কন্যার আকাঙ্ক্ষার মূল্য তারা দিত না। এমন কি লহনার খুড়ো জেনেশুনেও খুল্লনাকে সতীনের ঘরে বিবাহ দিয়েছে, তাই লহনার খেদোক্তি—

"খুড়া হয়ে দেয় সতা কারে কব দুঃখকথা
কারে বা করিব অভিমান॥(ঐ/৯৭)[১২৫]

পুরুষ নারীর মূল্য দেয়নি বলেই খুল্লনার পিতা রম্ভাবতীর নিষেধকে হেলায় দূরে সরিয়ে দেয়। রম্ভাবতী বার বার লক্ষপতিকে বোঝাবার চেষ্টা করেছে—

"হিতাহিত নাহি গণনা লব কন্যার পণ
কেন ঝিয়ে করাব দুর্গতি।" (ঐ/৯৬)[১২৬]

কিন্তু অদৃষ্টবাদী অশিক্ষিত বাঙালী সমাজ পুরোহিত ও গণৎকারের দ্বারা প্রতারিত হত। সাধুপত্নী তাই ঘটককে প্রতারণার জন্য তিরস্কার করে—

"সাধুপত্নী বোলে বিপ্র কহ বারে বারে।
তোহার কারণে কৈন্যা আনলেত পড়ে॥" (দ্বিজ রামদেব/১২৯)

রম্ভাবতী অদৃষ্টে বিশ্বাসী, তাই পুরুষের প্রতারণা বোঝার ক্ষমতা বা ইচ্ছা তার নেই। লক্ষপতির কথা—

"গণকে কয়েছে মোরে দিবে দোজবেরে বরে
বিচারিয়া বিধবা-লক্ষণ॥" (মুকুন্দ/৯৬)[১২৭]

নারীগণের পতিনিন্দা অংশে নারীর দুরবস্থার যে চিত্র পাওয়া যায়, নারী সম্পর্কিত সমাজ মানসিকতাই এর জন্য দায়ী বলে চিহ্নিত করা যায়।

মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থায় নারী শুধু বধূ হিসাবেই নয়, পারিবারিক জীবনে পুরুষের যথার্থ সহধর্মিনী, সহকর্মিনী হয়ে ওঠার চেষ্টা করত। নিজের কামনা-বাসনা পরিহার করে স্বামী-পুত্রের কল্যাণ কামনায় নারী ছিল নিবেদিতপ্রাণা। ধনপতির বাণিজ্য যাত্রাকালে খুল্লনার চণ্ডীপূজা স্বামীর মঙ্গল কামনার জন্যই। শুধু তাই নয়, নারী

অনেকক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সহায়তার দ্বারা জীবিকা অর্জনে সাহায্য করত। নিম্নবর্ণের সমাজে নারী খেয়া দিয়ে, পসরা দিয়ে অর্থ উপার্জন করত। ফুল্লরা সংসারযাত্রা নির্বাহের জন্য মাংসের পসরা সাজিয়ে বিক্রি করে, দুর্বলা দাসী ধনপতির গৃহে পরিচারিকা বৃত্তি গ্রহণ করে। মঙ্গলকাব্যের মূল সুরটিও এখানে প্রতিধ্বনিত হয়েছে, এই সুরটি হল- শাক্ত দেবতা তথা পুরুষ শক্তির জীর্ণতায় নারী শক্তির উত্থান । বস্তুতঃ ব্যাভিচার অকর্মণ্যতা, অনৈতিকতার ফলে পুরুষ তার শক্তি ও সামর্থ্য হারিয়ে ফেলেছিল, তাই নারী শক্তির উত্থান প্রয়োজন হয়েছিল। পুরুষশাসিত সমাজ তাদের কর্তৃত্বের মুঠি শিথিল করতে চায়নি, তাই পুরুষ সমাজের আপত্তি স্ত্রী শক্তির উত্থানের বিরুদ্ধে। তাই ধনপতি খুল্লনাকে জানায়—

"কেমন দেবতা এই পূজিস্ ঘটবারি।
স্ত্রীদেবতার আমি পূজা নাহি করি॥"(ঐ/১৫৩)[১২৮]

কিংবা—

"মোর ব্রত ভঙ্গ কৈলি হইলি কুলের কালী
মেয়ে দেব পূজি হইলি অরি॥" (ঐ/১৫৪)[১২৯]

নারীই আসলে নারী শক্তির উত্থান কামনা করেছিল। যেভাবে মনসা আপন প্রতিষ্ঠা খুঁজেছিল তেমনি ভাবে চণ্ডীমঙ্গলে দেবী চণ্ডী অকর্মণ্য শিবঠাকুরের সংসারের দারিদ্র্য মোচনের জন্য প্রতিষ্ঠা খুঁজেছিল। আর সাধারণ নারীগণ মেনে নিয়েছিল— "যে হোক সে হোক স্বামী নারীর ভূষণ।"(ঐ/২০)। কিন্তু সখী পদ্মার পরামর্শে দেবী আত্মপ্রতিষ্টার সংগ্রামে নিযুক্ত হয়েছিল। কেননা স্বামী বিড়ম্বিতা কন্যা পিতৃগৃহে সম্মান পেত না। তাই দেবী পিতৃগৃহে না গিয়ে পুরুষশাসিত উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ্য সমাজের প্রতিভূ কলিঙ্গরাজকে কঠোর স্বপ্নাদেশ দেয় এবং কলিঙ্গরাজই প্রথম চণ্ডীমঙ্গলে স্ত্রীদেবতার কর্তৃত্ব স্বীকার করে। এভাবে ক্রমাগত নিম্নবর্ণের সমাজ থেকে উচ্চবর্ণের সমাজে স্ত্রীদেবতা তথা নারী শক্তি প্রতিষ্ঠা পেতে থাকে।

চণ্ডীমঙ্গলে বাঙালী সমাজের বহুবিধ প্রবণতার কথা আছে, যেমন— ধর্মপ্রাণ বাঙালীর তীর্থ পর্যটন একটি বিশিষ্ট বিষয়। ধনপতির বাণিজ্যযাত্রার সময় বহু তীর্থের পরিচয় পাওয়া যায় এবং দেখা যায় ধনপতি প্রতিটি তীর্থে পূজা করে। বৃদ্ধ বয়সে তীর্থবাস বাঙালী হিন্দুর বিশেষ প্রবণতা। বৃদ্ধ বয়সে পুত্রকে সংসারে প্রতিষ্ঠিত করে তীর্থবাস উচ্চবর্ণের সমাজে প্রচলিত ছিল, কিন্তু হয়ত কবি আপন সমাজের সত্যকে নিম্নবর্ণের সমাজে চাপিয়ে দিতে চেয়েছেন অথবা নিম্নবর্ণের সমাজেও ধীরে ধীরে উচ্চবর্ণের সমাজের এই রীতি প্রবেশ করেছিল। মুকুন্দ চক্রবর্তী লিখেছেন-

"মুক্তি-পথে দিয়া মন শিব চিন্তে অনুক্ষণ
শুনয়ে পুরাণ উপাখ্যান।
জায়া সঙ্গে ধর্ম্মকেতু ভাবিয়া মুক্তির হেতু
বারাণসী করিল প্রস্থান॥" (ঐ/৩৯)[১৩০]

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে মধ্যযুগীয় সমাজের বাঙালী মানসিকতার বহু পরিচয় আছে, যার মধ্যে দিয়ে বাঙালী চরিত্রের অন্তর্ধর্মের পরিচয় পাওয়া যায়, যা আজও সম্পূর্ণ রূপে অবসান হয়নি। যেমন বাঙালী ঘরের কন্যাগণ পতিগৃহে আসার পর দীর্ঘদিন পিতৃগৃহে যেতে পারত না, পাড়া প্রতিবেশী সকলকে নিয়েই সুখে-দুঃখে তাদের দিন কেটে যেত। পার্বতী কৈলাসে আসার পর আর একদিনের জন্য কোথাও যেতে পারেনি। এখানে তার সখী বা বান্ধবী কেউ নেই, তাই সতী বিনা নিমন্ত্রণেই পিতৃগৃহে যজ্ঞ দেখতে যেতে চায়। সতী মহাদেবকে জানায়—

"পর্ব্বত কাননে বসি নাহিক পাড়া পড়সী
সীমন্তে সিন্দুর দিতে সখী।
একতিল কোথা যাই জুড়াইতে নাহি ঠাঁই

বিধি মোরে কৈল জন্মদুঃখী॥
সুমঙ্গল সূত্র করে আইলাম তব ঘরে
পূর্ণ যে হইল বর্ষ সাত॥" (ঐ/৯)[১৩১]

শিবঠাকুর জানায়, বিনা নিমন্ত্রণে যাওয়া অনুচিত; কিন্তু নারীর পিতৃগৃহে যেতে নিমন্ত্রণ দরকার হত না। কন্যা পিতৃগৃহে ফিরে এলে মা ও বোনেরা সকলে মিলে দেখতে আসে, মঙ্গলবার্তা জিজ্ঞাসা করে, পিতামাতা তাকে মঙ্গল আশীর্বাদ করে। সতী পিতৃগৃহে এলে মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যে অনুরূপ মানসিকতার পরিচয় পাই—

"পাইলা বাপের গ্রাম শুনিয়া সতীর নাম
প্রসূতি ধাইল বেগবতী॥
কোলেতে লইয়া সতী প্রসূতি পুলকবতী
কৈলা চণ্ডী মায়ের প্রণতি॥
.. ..
জননী ভগিনী সঙ্গে ক্ষণেক থাকিয়া রঙ্গে
যান দেবী যজ্ঞের সদন॥" (ঐ/১০)[১৩২]

পিতামাতাকে প্রণাম করা বাঙালী সমাজের বিশেষ প্রবণতা এবং পিতামাতা বিবাহিতা কন্যাকে আশীর্বাদ করে— 'স্বামী চিরজীবী হোক' কিংবা 'এয়োতে জীবন অতিবাহিত হোক' বলে।সতী প্রণাম করলে দক্ষ প্রজাপতি তাকে আশীর্বাদ করে বলে—

"দক্ষের চরণে সতী করিল প্রণতি।
হেট মুখে আশিস্ করিল প্রজাপতি॥
এয়োতে যাউক কাল ঘুচুক দুর্গতি।
চিরজীবী হোক স্বামী সুস্থির সুমতি॥" (ঐ)[১৩৩]

আবার মধ্যযুগীয় বাঙালীর বিচিত্র মানসিকতার ছবি ধরা পড়েছে চণ্ডীমঙ্গলে 'নাগরিদিগের বর দর্শনে গমন' অংশে। বিয়েবাড়িতে নতুন বর দেখতে যাওয়ার বিচিত্র প্রবণতা দেখা যায় চণ্ডীমঙ্গলে। কবিকঙ্কণ সুন্দরভাবে তার চিত্র অঙ্কন করেছেন, যেমন—

"ত্বরা হেতু সবাকার বিপর্য্যয় বেশ।
এলোকরি ধায় কেহ নাহি বান্ধে কেশ॥
. . . . . .
চড়িয়া জাঙ্গালে এয়ো দিল বাহু নাড়া।
আঁখির কটাক্ষে ভাঙ্গিয়া আইল পাড়া॥" (ঐ/১৯)

আবার প্রথার দায়ে ষোড়শী কন্যার বৃদ্ধের সঙ্গে বিবাহ হলে কনের মাতা বা সখীদের কিছুই করার থাকত না কিন্তু তারা অসন্তোষ প্রকাশ করে গালিগালাজ করত। এখানে বাঙালী নারীর বিশিষ্ট মনোভঙ্গী ও বাক্‌রীতির প্রকাশ বাঙালীর নিজস্ব বিষয়।বৃদ্ধ শিবঠাকুরকে দেখে উপস্থিত নারীগণ গৌরীর পিতাকে তিরস্কার করে এই কথাগুলি বলে—

"বর দেখি এয়োগণ করে কানাকানি।
চক্ষু খাক্ পিতা চক্ষে পড়ুক ছানি।
হেন বরে কন্যা দেয় কি দেখি সম্পদ।
বাপ হয়ে মূঢ়মতি কন্যা করে বধ।"(ঐ)[১৩৪]

কিংবা মেনকার বাক্‌রীতি বিশেষত্বপূর্ণ—

"মর মর হেমন্ত তোমারে কব কি।
এ বুড়া পাগল বরে দিলা হেন ঝি॥" (ঐ)

আবার শিবের মদনমোহন রূপ দেখে তারাই নিজ নিজ স্বামী দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করে পতিনিন্দা করেছে। এরকম বিচিত্র বাঙালী মানসিকতার প্রকাশ আছে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে মানব চরিত্রগত অনুবর্তন লক্ষণীয়। বস্তুতপক্ষে মনসা চৈতন্য-পূর্ববর্তী কালের দেবী, আর চণ্ডী চৈতন্য-পরবর্তীকালের দেবী বলে চিহ্নিত করলে লক্ষ করা যায় মনসামঙ্গল থেকে চণ্ডীমঙ্গলে আচার-বিচার-সংস্কারগত বিষয়টি ব্যতিরেকে মনসাই ক্রমাগত চণ্ডীতে রূপান্তরিত হয়েছে। মনসা থেকে চণ্ডীর উত্তরণ বস্তুতপক্ষে সমাজের উত্তরণ। প্রথম যুগে রচিত মনসামঙ্গলে মনসার যে লোলুপতা ও ক্রুরতা দেখা যায় পরবর্তীকালের কাব্যে তা দেখা যায় না, পক্ষান্তরে চণ্ডী অনেক বেশী মমতাময়ী। মনসার কখনো মাতৃসুলভ আচরণ দেখা যায়নি অথচ জগজ্জীবনের কাব্যে মনসা পীরিতের পূজা কামনা করে দ্বন্দ্ব-সংঘাত এড়াতে চেয়েছে, আর চণ্ডীর কালকেতুর সঙ্গে কোন বিরোধ নেই। বণিক খণ্ডে চণ্ডী নারী দেবতা হিসাবে শৈব সমাজে জায়গা করে নিতে একটু সময় নিয়েছে মাত্র। খুল্লনা, শ্রীমন্ত দেবী চণ্ডীর ভক্ত; ধনপতির চণ্ডী বিরোধিতার ভিত্তি খুব শক্ত নয়, চাঁদের মত দৃঢ়তা তার চরিত্রে নেই; যদিও বন্দিশালে দেবী ধনপতিকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে চণ্ডী পূজার পরামর্শ দিলে ধনপতি জানায়—

"যদি বন্দিশালে মোর বাহিরায় প্রাণী।
মহেশ ঠাকুর বিনে অন্য নাহি জানি॥"(ঐ/১৬৫)[১৩৫]

আসলে ধনপতির চণ্ডী বিরোধিতার প্রত্যক্ষ কোন কারণ নেই। চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে মনসার ক্রুরতা হ্রাস পেয়ে কোমল হয়েছে। চণ্ডী অনেক বেশী মাতৃপ্রতিম, কালকেতুকে বর দিয়ে কৌশলে পশু সমাজকে রক্ষা করাই তার উদ্দেশ্য। কালকেতুর অনিষ্ট নয়— কারণ পশুগণ ও কালকেতু সবাই তার ভক্ত। তাই লক্ষণীয়, মনসামঙ্গলে রাখালগণ, মুসলমান কাজী, চাষাভূষা বচাই, জালুমালু প্রত্যেকেই মনসার বিরোধিতা করে শেষে ভক্ত হয়েছে; এমন কি সনকা মনসার ভক্ত নয়, দেবীর ঐশ্বর্যের কথা শুনেই সে ভক্ত হয়েছে। কিন্তু চণ্ডীর পূজা প্রচারের পথ অনেক মসৃণ; একমাত্র ধনপতি ছাড়া সবাই দেবীর অনুকূলে। তাই চণ্ডী সহজেই ধনপতির পূজা আদায় করতে পেরেছে, তাকে ক্রুর হতে হয়নি, অন্যায় বা নীচতা প্রদর্শন করতে হয়নি। তাছাড়া মধ্যযুগে নারীই নারী শক্তির প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করে। মনসার আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে প্রধান অন্তরায় চণ্ডী, কিন্তু চণ্ডীর প্রতিষ্ঠায় নারী অনুকূল, এইভাবে সমাজচরিত্রগত বিবর্তনটি ধরা পড়েছে। ব্যাধ কাহিনী বাদ দিলে চণ্ডীমঙ্গলে বণিক খণ্ডের সঙ্গে মনসামঙ্গলের কাহিনীগত একটা সম্পর্ক আছে। ধনপতি-চাঁদসদাগর, লহনা-সনকা, খুল্লনা-বেহুলা, শ্রীমন্ত-লখীন্দর বিবর্তিত চরিত্র হতে পারে। সনকা যেখানে চাঁদের লোলুপতা ও ক্রুরতাকে নীরবে সহ্য করে গেছে, লহনা ধনপতির প্ররোচনায় ভুলে গেলেও নিজের দাবী সহজে ছাড়তে চায়নি। বেহুলা শুধু মাত্র দৈবপ্রত্যাশী বাঙালী গৃহবধূ কিন্তু খুল্লনা নিজ পুত্রকে তৈরী করেছে নিজের অনুকূলে। সে ও অবশ্য বাঙালী গৃহবধূ, বাঙালী মা। লখীন্দর যেখানে নিষ্ক্রিয় চরিত্র, সেখানে শ্রীমন্তের ব্যক্তিত্ব অনেকটাই জাগ্রত। চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্ম আন্দোলন যেটুকু ব্যক্তি চেতনার জাগরণ ঘটাতে পেরেছিল তা চণ্ডীমঙ্গলের চরিত্রগুলিতে রয়েছে। অন্যান্য কতকগুলি গৌণচরিত্রে মধ্যযুগীয় ব্যক্তিত্বহীনতার ছাপ আছে, যেমন ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বর সেকালের অলস, অকর্মণ্য জমিদার পুত্র, বাপের আদরে, সে মায়ের স্নেহে পালিত।পিতার আদেশে ফুল তুলতে গিয়ে ধর্মকেতুকে শিকার করতে দেখে নিজের প্রতি তার ধিক্কার জেগেছে, কারণ পিতার শিবপূজা সাঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত তার খাওয়ার উপায় নেই। মধ্যযুগে এক শ্রেণীর ধনী জমিদারপুত্ররা আরামে-আয়েসে দিন যাপন করত। নীলাম্বর নিজের সম্পর্কে বলেছে—

"না করিনু কোন কর্ম্ম বিফল দেবতাজন্ম

বিদ্যার না কৈনু অন্বেষণ।
না করিলু ধনুশিক্ষা কেমনে পাইব রক্ষা
যদি হয় দেবাসুরে রণ॥" (ঐ/৩২)[১৩৬]

শিব চরিত্রেও পরিবর্তন দেখা যায়। মনসামঙ্গলের শিবঠাকুর হীন চরিত্র ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্রাহ্মণ সমাজপতি, এবং চণ্ডীমঙ্গলের শিবঠাকুর ভিখারী; মনে করা যায় মনসামঙ্গলের শিব চরিত্রেরই অনিবার্য পরিণতি চণ্ডীমঙ্গলের শিবঠাকুর।

জাতিবৃত্তি ঃ মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা গঠন সমৃদ্ধ ও তথ্য সমৃদ্ধ কাব্য চণ্ডীমঙ্গল এবং চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের মধ্যে পরিব্যাপ্তি ও সামগ্রিকতায় কবিকঙ্কণ চণ্ডী অনন্য। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কালকেতুর গুজরাট নগর পত্তন অংশে ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর বাঙালী সমাজের অখণ্ড চিত্র আছে। প্রত্যেক কবিই চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বাঙালী সমাজের জাতি-বৃত্তিগত বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন তন্মধ্যে কবিকঙ্কণ চণ্ডী অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ। 'মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল আলোচনা ও পর্যালোচনা' গ্রন্থের 'মুকুন্দের সমাজ চেতনা এবং কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে তৎকালীন সমাজ' প্রবন্ধে ডঃ সুমঙ্গল রাণা লিখেছেন- "নব-নির্মিত গুজরাটনগরে বিভিন্ন জাতির সমাগম উপলক্ষে বাঙ্গালী সমাজের একটি অখণ্ড চিত্র লিপিবদ্ধ হয়েছে। কেবলমাত্র সমাজসচেতনতার কথা নয়, সমাজতত্ত্ব নিয়ে যাঁরা কাজ করেন বিষয়টি তাঁদের কাছেও সবিশেষ মূল্যবান। কারণ জাতিভেদ অবলম্বন করেই বাঙ্গালী সমাজের কাঠামো। কেবল বাঙ্গালী সমাজ নয়, জাতিভেদ সমগ্র ভারতীয় সমাজব্যবস্থার মূল ভিত্তি।বর্ণবিন্যাস আর্য-সমাজব্যবস্থার প্রধান অবলম্বন ছিল। আর্যগণ এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করার ফলে এদেশের সমাজব্যবস্থাতেও বর্ণবিন্যাস প্রবর্তিত হয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র আর্য সংস্কারের এই মূল চারটি বর্ণ ছাড়াও অব্রাহ্মণ যে ছত্রিশটি বর্ণের উল্লেখ পাওয়া যায় সেগুলি ওই চার বর্ণের সংসর্গজাত সন্তান থেকে সৃষ্ট। - - -মুকুন্দের কাব্যে সেকালের সমাজে কোন্ কোন্ জাতি কি কি কর্মে নিযুক্ত থাকতো তার সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়।"[১৩৮] এ মন্তব্য বাঙালীর সামাজিক ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ। বৃহদ্ধর্মপুরাণে ছত্রিশটি বর্ণের উল্লেখ থাকলেও একচল্লিশটি বর্ণের নাম আছে, অর্থাৎ প্রথমে ছত্রিশটি বর্ণ থাকলেও পরে পাঁচটি উপবর্ণ যুক্ত হয়েছে তালিকায়। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেও ছত্রিশটি জাতির কথা আছে। তবে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, নতুন নতুন সংমিশ্রণের মধ্যে দিয়ে সমাজে নতুন নতুন বর্ণ সৃষ্টি হয়েছে। মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যে এই জাতি-বৃত্তির বিস্তৃত পরিচয় আছে এবং কোন্ কোন্ জাতি বা বর্ণের মানুষ কোন্ বৃত্তি বা পেশায় নিযুক্ত থাকত তার পরিচয় আছে। অন্যান্য চণ্ডীমঙ্গল কাব্যগুলিতেও তার সামান্য পরিচয় আছে। মানিক দত্তের কাব্যে কালকেতুর গুজরাট নগরে জনবিন্যাসের পরিচয় রয়েছে। এখানে জন্মভিত্তিক ও বৃত্তিভিত্তিক বিভিন্ন শ্রেণীর উল্লেখ আছে, যথা- জন্মভিত্তিক শ্রেণীতে পড়ে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, কোচ, দোসাউদ,ডোম, ব্যাধ. যবন, চাঁই, কেওট, হাড়ি, কাড়ি, কৈবর্ত, গুড়ি, পরি, কুড়ি, বারুই, তিওর, চাঁড়াল, পাঠান, ইত্যাদি। আবার বৃত্তিভিত্তিক শ্রেণীর মধ্যে তেলী, নবনিয়া, গোপ, বাণিয়া, আহীর, সূত্রধর, করাতি, তাম্বুলী, নাটুয়া, ভাট, পালী, বায়ন, নাপিত, গুনী, জুগী, চাষা, সন্ন্যাসী, বৈদ্য, বেরুণিয়া, ভাণ্ডারিয়া, গোয়ালা, মালী, কামার, কুমার, জালিয়া., তাঁতি, মোদক, হালুই, পক্ষবেচা, মাছুয়া, ঢালী, বন্দুকী, লস্কর, পাইক. ধানুকী, ভারী, কারিগর, বাদিয়া, দাই, কাহার. পাচতি ইত্যাদি। মানিক দত্তের বর্ণনানুসারে—

"কত জাতি ব্রাহ্মণ বৈসে লেখা নাহি তারে॥
কাএস্ত বসিয়া গেল বৈদ্য আশি ঘর।
. . . . . .
তেলী মালী বসি গেল কুমার কামার।
ছত্রিশ জাইত প্রজা বৈসে বীরের বাজার॥"(মানিক/১৩২)

স্থানের নামকে ভিত্তি করে কিছু জাতির সৃষ্টি হয়েছে, যথা— উড়িয়া, বাঙালী, তৈলঙ্গা, রোহিলা ইত্যাদি। ব্যবসা-বাণিজ্য বা যুদ্ধবিগ্রহের কারণে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মানুষ বাংলাদেশে এসে বসতি স্থাপন করেছিল। চণ্ডীমঙ্গলে বিভিন্ন জাতির গাঁঞি-গোত্র সমেত পরিচয় আছে। বিভিন্ন উপাধিধারী ব্রাহ্মণের বিভিন্ন গোত্র। বিভিন্ন গোত্রের ব্রাহ্মণের মধ্যে কাস্যবংস, সাবর্ণিক সম্ভবত পঞ্চ গোত্রের প্রধান; তাছাড়া শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ, কাশ্যপ ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত নিম্নগোত্রের ব্রাহ্মণ। দ্বিজ রামদেবের কাব্যে আছে—

"কাস্যবংস যত আইসে সাবর্ণিক লইয়া বৈসে
বৈসে পঞ্চ গোত্রের প্রধান॥
. . . . . .
বসিল শাণ্ডিল্যধারা ভরদ্বাজে বান্ধে পাড়া
কাশ্যপ বসিল স্থানে স্থান॥" (দ্বিজ রামদেব/৭৬)

মুকুন্দ চক্রবর্তী ব্রাহ্মণের উপাধি সমেত পরিচয় দিয়েছেন, এগুলি হল— মুখুটি, চাটুতি, বন্দ্য, কাঞ্জিলাল, ঘোষাল, গাঙ্গুলী, হড়, কেশর, গুড়, পুততুণ্ডি, বড়াল, মতিলাল, পিপলাই ইত্যাদি। কবি কঙ্কণের বর্ণনানুসারে—

"কুলে শীলে নহে নিন্দ্য মুখুটি চাটুতি বন্দ্য
কাঞ্জিলাল গাঙ্গুলী ঘোষাল।
. . . . . .
বটগ্রামী নন্দী-গাঁই ভাটাতি সিদ্ধলদায়ী
নায়েবী কোয়াবী মতিলাল॥" (মুকুন্দ/৬৯)

ব্রাহ্মণের বিভিন্ন বিভাগ, যেমন— বরেন্দ্রী, রাঢ়ী ইত্যাদি। বরেন্দ্রীরা বোধহয় অপেক্ষাকৃত উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ, কেননা তাদের গাঁই নাই গোত্র আছে।মুকুন্দ লিখেছেন—

"গাঁই নাই গোত্র আছে বসিল বীরের কাছে
বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সাত শত॥" (ঐ)

শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ নামে এক ধরনের ব্রাহ্মণের কথা আছে দ্বিজ মাধবের কাব্যে; এরা সম্ভবতঃ নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের মধ্যে যে সুস্পষ্ট উচ্চ-নীচ ব্যবধান ছিল চণ্ডীমঙ্গলে তার পরিচয় আছে। কেননা গুজরাট নগরে ব্রাহ্মণগণও তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী বাসস্থান পায়—

"বিপ্রবর্গ যত আইসে বীরের নগরে বৈসে
যার যে জানিয়া যোগ্য স্থান॥"(দ্বিজ রামদেব/৭৬)

ব্রাহ্মণের বৃত্তি ছিল প্রধানত যজন-যাজন, পূজাপাঠ, অধ্যাপনা; শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণরা সাধারণত পূজাপাঠ, হোম, বেদপাঠ করত। অপেক্ষাকৃত উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ অধ্যাপনা করত। দ্বিজ মাধবের কাব্যে আছে—

"শ্রোত্রিয় যথেক বৈসে নিত্য চারি বেদ পঠে
জপ হোম করয়ে তৎকাল॥
আর আর দ্বিজগণ কেহ করে অধ্যাপন
যজন-যাজন বহুতর।
উচ্চারি প্রণব দ্বিজকুল সম্ভব
হুতাশনে হোমে নিরন্তর॥" (দ্বিজ মাধব/৬৫)

অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণ ধর্মচর্চা, শাস্ত্রচর্চা, অধ্যাপনা পূজাপাঠ নিয়েই থাকত। গ্রহ-বিপ্রগণ শাস্ত্রবিচার করে কুলজি, ঠিকুজি রচনা করত। আবার এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী হয়ে ধর্মচর্চা করত—

"গুজরাটে এক পাশে গ্রহ-বিপ্রগণ বৈসে
বর্ণ-দ্বিজগণ মঠপতি।
দীপিকা ভাস্বতি ধরে শাস্ত্র বিচার করে
বালকের লেখে জন্মপাতি॥
মাথায় পিঙ্গল জটা সন্ন্যাসী কপালী ঘটা
ঝুপড়ি বান্ধিয়া এক পাশে।
গায়ে নানা তীর্থ চিন্ ভিক্ষা করি অনুদিন
এক পাশে তারা সব বৈসে॥" (মুকুন্দ/৬৯)[১৩৭]

এক শ্রেণীর শিক্ষাদীক্ষাহীন ব্রাহ্মণ যজমানিবৃত্তি অবলম্বন করে ঘরে ঘরে দেবপূজা করে, ভিক্ষা করে, শ্রাদ্ধশান্তি, ঘটকবৃত্তি গ্রহণ করে জীবিকা নির্বাহ করত। কবিকঙ্কণের বর্ণনায়—

"মূর্খ বিপ্র বৈসে পুরে নগরে যাজন করে
শিখয়ে পূজার অধিষ্ঠান
. . . . . .
গালি দিয়া লণ্ডভণ্ডে ঘটক ব্রাহ্মণ দণ্ডে
কুলপাঁজী করিয়া বিচার।
যে নাহি গৌরব করে সভায় বিড়ম্বে তারে
যাবৎ না পায় পুরস্কার॥" (ঐ)[১৩৮]

চণ্ডীমঙ্গলের শিবঠাকুর এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলে মনে করা যায়। চণ্ডীমঙ্গলে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কথা পাই, সম্ভবত ব্রাহ্মণরাই বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল; যদিও চৈতন্যদেব আচণ্ডাল বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। এরা সাধারণত সর্বদা হরিনাম সংকীর্তন করত—

"সদা লয় হরিনাম ভূমি পাইয়া ইমান
বৈষ্ণব বসিল গুজরাটে।" (ঐ)[১৩৯]

পরবর্তীকালে বৈষ্ণবগণ বোধ হয় ব্রাহ্মণ শ্রেণীর মধ্যেই গণ্য হয়েছিল, তাই মুকুন্দ চক্রবর্তী ব্রাহ্মণের অংশেই বৈষ্ণবদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাছাড়া ক্ষত্রিয়রা সাধারণত শাসনকার্য পরিচালনা করত, এদের মধ্যে মল্ল, রাজপুতরা সেনাবাহিনীতে কাজ করত, যুদ্ধবিগ্রহ করত।বৈদ্যরা চিকিৎসা করত, এদের উপাধি হল— গুপ্ত, সেন, দাস, দত্ত, কর ইত্যাদি। কায়স্থগণের মধ্যে প্রধান হল ঘোষ, বসু ও মিত্র, তাছাড়া পাল, নন্দী, পালিত, সিংহ, দেব, কর, নাগ, সোম, চন্দ্র, ভঞ্জ, বিষ্ণু রাহা, বিন্দ ইত্যাদি উপাধিধারীগণ। এরা সাধারণত বিদ্যাচর্চা, রাজদ্বারে চাকুরীবৃত্তি গ্রহণ করত অর্থাৎ এরা বুদ্ধিজীবী শ্রেণীতে গণ্য হত। দ্বিজ মাধব লিখেছেন—

"কা'স্ত বৈসে নগরে করেতে কলম ধরে
কেহ কেহ বৈসে রাজ-দ্বারে॥" (দ্বিজ মাধব/৬৬)

মুকুন্দ চক্রবর্তী 'অগ্রদানী' বলে এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণের কথা উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত এরা পতিত ব্রাহ্মণ। এদের বৃত্তি মৃতের শ্রাদ্ধের অগ্রদান গ্রহণ—

"বৈদ্য জনের পাশে অগ্রদানীগণ বৈসে
নিত্য করে রোগীর সন্ধান।
রাজ-কর নাহি দেয় বৈতরণী ধেনু লয়
হেম রজত লয় তিলদান॥" (মুকুন্দ/৭০)[১৪০]

বৃহদ্ধর্মপুরাণ মতে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অম্বষ্ঠ ও করণ দুই বর্ণ সঙ্কর বর্ণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এরা ব্রাহ্মণের পরেই মর্যাদা পেয়েছিল। মুকুন্দ চক্রবর্তী এদের জাতি ও বৃত্তির উল্লেখ করেছেন। বণিক ও নবশাখ সম্প্রদায় বৈশ্য; এদের জাতি ব্যবসা বা জাতিগত বৃত্তি ছিল। এরা হল গোপ, তেলী, তাম্বুলী, বারুজীবী, নাপিত, কামার, কুমার, তন্তুবায়, মোদক, সরাক, কাঁসারি, শাঁখারি, সুবর্ণ বণিক ইত্যাদি। এদের বৃত্তিরও উল্লেখ আছে, যেমন— গোপরা কৃষিকার্য করত, তেলীরা তেল বিক্রয় করত, কামাররা লোহার জিনিসপত্র তৈরী করত, তাম্বুলীরা পান-সুপারি বিক্রয় করত, কুমারগণ মাটির হাঁড়ি তৈরী করত, মালীরা ফুল বিক্রয় করত, বারুইরা পান চাষ করত, নাপিত ক্ষৌরকর্ম করত, মোদক মিষ্টান্ন তৈরী করত, সরাকগণ তাঁতি না হলেও কাপড় বুনত, গন্ধদ্রব্য বিক্রয় করত গন্ধবেণেরা, শাঁখারিগণ শাঁখা তৈরী করত, কাঁসারীগণ কাঁসার জিনিসপত্র তৈরী করত, সুবর্ণ বণিকগণ গহনার কাজ করত। এই বৃত্তিধারীরা ব্রাহ্মণদের কাছে একেবারে জলঅচল ছিল না। এদের মধ্যে তেলী, তাম্বুলী, বারুজীবী, গোপ, নাপিত, কামার, কুমার, তন্তুবায়, মোদক নবশাখ বলে চিহ্নিত। এদের পরেই বিভিন্ন শ্রেণীর বণিকদের স্থান। এর পরে আসে বিভিন্ন অন্ত্যজ-অস্পৃশ্য জাতির মানুষ, যেমন- কলু, বাইতি, বাগদী, মাছুয়া বা জেলে, কোচ, ধোবা, দরজি, সিউলি, ছুতার, পাটনি, ভাট, চৌদুলি চুনারি, মাঝি, কোরঙ্গা, ধোয়ারা, ধাজি, মাল, চণ্ডাল, কোয়ালি, মারহাটা, পুলিন্দ, কিরাত, কোল, জায়াজীবী, কেওলা, হাড়ি, শুঁড়ি, চামার, ডোম ইত্যাদি। এদের প্রত্যেকের বৃত্তিগত অবস্থান আছে, এরা মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থায় সেবক শ্রেণীর অন্তর্গত। জেলে বা মাছুয়ারা এবং কোচরা জাল বুনত ও মাছ ধরত, কলুরা ঘানি দিয়ে তেল তৈরী করত, বাইতি বাজনা বাজাত, বাগদীরা পাইক ও বরকন্দাজের কাজ করত, পাটনী নৌকা পারাপার করত, ধোবা কাপড় ধুত, সিউলিগণ খেজুরের রস থেকে গুড় তৈরী করত, দরজি কাপড় সেলাই করত, ছুতাররা মুড়ি-চিড়া ভাজত ও চিত্র নির্মাণ করত, চৌদুলিরা দোলা বহন করত, চুনারী চুন তৈরী করত, মাঝিরা খেয়া দিত, কোরঙ্গাগণ কাপড়ে মাড় দিত, কোয়ালিগণ গোহাল্যা গীত গাইত ও গোয়ালপূজা ক'রে ভিক্ষা করত, চণ্ডালরা লবণ বিক্রয় করত, মারহাটারা চোখের ছানি ও প্লীহা কাটত, হাড়িরা ঘাস কেটে বিক্রয় করত, পুলিন্দ, কিরাত ও কোলরা হাটে ঢোল দিত ও সংবাদ বহন করত, শুঁড়িরা মদ চোলাই করত, চামার জুতা সেলাই করত, ডোমরা বাঁশ ও বেতের কাজ করত। কবিকঙ্কণের কাব্যে বারবধূদের উল্লেখ আছে, সমাজে তাদের ও স্বতন্ত্র বাসস্থান ছিল, কিন্তু এরা অস্পৃশ্য ছিল। বণিকরা অর্থ কৌলীন্যের জোরে সমাজে স্থান করে নিতে পেরেছিল। যাই হোক, গুজরাট নগরের জনবিন্যাস থেকে স্পষ্ট যে সমাজে ধীরে ধীরে নতুন নতুন জাতি সৃষ্টি হয়ে সামাজিক স্তর বিন্যাসের পরিবর্তন ঘটেছে। তাই বারবধূরাও পৃথক শ্রেণী হিসাবে বাসস্থান পেয়েছে। কবিকঙ্কণের উল্লিখিত বাঙালী হিন্দুসমাজের অনেক জাতি কালক্রমে লুপ্ত হয়ে গেছে। যেমন— রাঢ়, সরাক, সিউলি, কোরঙ্গা, কোয়ালি, চুনারি, চৌদুলিয়া ইত্যাদি। 'রাঢ়' একটি অঞ্চল বিশেষ হলেও জাতি বাচক শব্দ। কবিকঙ্কণ রাঢ়বাসীদের কথা বলেছেন কালকেতুর মুখে–

"ব্যাধ হিংসক রাঢ় চৌদিকে পশুর হাড়
এই স্থান শ্মশান সমান।
আমি কহি হিতবাণী এই ঘরে ঠাকুরানী
প্রবেশিলে উচিত হএ স্নান॥"[১৯/১৪১]

'রাঢ়' জাতির বৃত্তি ছিল শিকার ও পশুহত্যা, এরা সমাজে অস্পৃশ্য ছিল। সরাকগণ ছিল জৈন শ্রাবক, এরা নিরামিষ ভোজী এবং এরা পশুহত্যা করত না। এদের বৃত্তি তন্তুবয়ন কিন্তু এরা তাঁতি নয়।[২০]

চণ্ডীমঙ্গলে কালকেতুর গুজরাট নগর পত্তনের মধ্যে দিয়ে বাঙালী হিন্দুর সমাজ সংগঠনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণরা ছিল সমাজের মধ্যমণি সুতরাং তারা বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী ছিল এবং তারা নগরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে বসবাস করত। মানিক দত্ত লিখেছেন- "ব্রাহ্মণ টোলা বসিল নগর মাঝারে।"(মানিক /১৩২)।

কবিকঙ্কণের বর্ণনা অনুসারে ব্রাহ্মণ থেকে শুরু করে ক্ষত্রিয়, বৈদ্য, কায়স্থ, বণিক, ইতর জাতি, এমন কি বেশ্যাগণও গুজরাট নগরে স্থান পেয়েছে। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে সমাজে এদের অস্তিত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ছিল। কবির অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে সকলেই বাস করার অধিকার পেয়েছে। আসলে সে যুগে সমাজ সংগঠনের ফলে হিন্দুর গ্রামে সকলেরই প্রবেশাধিকার ঘটেছিল, এমন কি মুসলমানরাও গ্রামের নির্দিষ্ট এলাকায় বসতি স্থাপন করেছিল। মানিক দত্তের বর্ণনানুসারে ষোড়শ শতাব্দীর সমাজব্যবস্থায় প্রথমাবধি এ সকল বিভিন্ন জাতির মানুষের সহাবস্থান সম্ভব হলেও প্রত্যেকের সুসম্পর্ক বজায় ছিল তা নয়, বরঞ্চ বলা যায় কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্য সম্প্রদায়গুলির নৈতিক, সংস্কৃতিক ও ব্যবহারিক যোগেযোগ ছিল না। মানিক দত্ত গুজরাট নগরের জনগণ সম্পর্কে বলেছেন—

"কাহার জাঙ্গাল দিয়া কেহ নাহি জাএ।
কাহার পুষ্কনির জল কেহ নাহি খাএ॥" (মানিক/১৩৩)

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে মুসলমান সমাজ সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। মনসামঙ্গল কাব্যে নবাগত মুসলমান সম্প্রদায়ের সঙ্গে হিন্দুসমাজের সংঘর্ষের চিত্র পাওয়া যায়। চণ্ডীমঙ্গলে বিবরণ অনুসারে দীর্ঘকাল পাশাপাশি বসবাসের ফলে ধীরে ধীরে হিন্দু-মুসলমান সহাবস্থান সম্ভব হয়েছিল।

হিন্দুসমাজের মত মুসলমান সমাজেও বিভিন্ন শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছিল, যেমন মানিক দত্তের কাব্যে আছে পাঠান, খোজা, মীর, কাজী, ফকির, মোল্লা, সেক, মীরবাখর ইত্যাদি শ্রেণীর মুসলমানের কথা। মানিক দত্ত লিখেছেন—

"গাও দশ খোজা বৈসে এ মরা নগরে।
কাজি মোল্লা জত সব বসিল থরে থরে॥
সেক ফকির বৈসে গেল শানকি বোঝা ২।
এক সাথে বৈসে গেল আশি হাজার খোজা॥" (ঐ/১৩২)

এদেশে আগত মুসলমানদের নানান বিভাগ ছিল, যথাক্রমে— সৈয়দ, মোগল, পাঠান, কাজী, মোল্লা, ইত্যাদি। পাঠানদের মধ্যেও নানা বিভাগ ছিল যথা- সাবানি, লোহানি, লোদানি, সুরয়ানী ইত্যাদি। কবিকঙ্কণের কাব্যে আছে-

"আইসে চড়িয়া তাজী সৈয়দ মোগল কাজী
খয়রাতে দিল বীর বাড়ি।
. . . . . .
সাবানি লোহানি আর লোদানি সুরয়ানি চার
পাঠান বসিল নানা জাত॥" (মুকুন্দ/৬৮)[১৪২]

মুসলমানদের নানান বৃত্তি ছিল, যথা— কাজীরা বিচারকার্য পরিচালনা করত, মোল্লারা ধর্মাচরণ করত, কলমা পড়ে নিকাহ বা বিয়ে দিত, মক্তব বা পাঠশালা করে শিক্ষাদান করত—

"মোল্লা পড়ায়ে নিকা দান পায় সিকা সিকা
দোয়া করে কলমা পড়িয়া॥
. . . . . .
যত শিশু মুসলমান তুলিল মক্তব স্থান
মখদম পড়ায় পঠনা।" (ঐ)[১৪৩]

হিন্দুর জাতিব্যবস্থার পীড়নে অন্ত্যজ হিন্দুরা ধর্মান্তরিত হল কিন্তু বৃত্তি বদল হল না, নতুন নামে শ্রমজীবী উৎপাদক শ্রেণী হিসাবে মুসলমান সমাজেরই নিম্নকোটিতে স্থান পেল। হিন্দুসমাজের মধ্যে থেকে মুসলমানদের মধ্যেও নানা

বৃত্তিজীবী উপশ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছিল, যেমন— গোলা, জোলা, বেনটা মুকেরি, পিঠারি, সানাকর, কাবাড়ি, গরসাল, তাঁতি, তীরকর, কাগচী, কলন্দর, রঙরেজ, হাজাম, দরজি ইত্যাদি। ডঃ আহম্মদ শরীফ এসম্পর্কে লিখেছেন— "তাই তাঁতী মুসলিম হয়ে হল জুলহা; হাড়ি-ডোম-বাগদি-চাঁড়াল-ব্যাধ নামান্তরে হল জেলে, নিকেরী, কাহার, কসাই, মুলঙ্গী, রঙরেজ, মুজারী, কাগজী, মণ্ডল, বিশ্বাস, সর্দার প্রভৃতি না ঘুচল তাদের অশিক্ষা, না ঘুচল তাদের দারিদ্র্য।"[২১] মুকুন্দের বর্ণনা অনুসারে গোলারা নিয়মিত রোজা-নমাজ করত, জোলারা তাসন করত (তক্ষন বা বোনা বা বয়ন), বলদের গাড়ী চালাত মুকেরিরা, পিঠা বিক্রয়কারীরা পিঠারী, সানা নির্মাণ কারীরা সানাকর, কাবাড়িরা মাছ বিক্রয় করত, পট আঁকা ও বিক্রি করা তাঁতিদের কাজ, তীরকরগণ তীর তৈরী করত, কাগচীরা কাগজ তৈরী করত, রঙরেজরা কাপড় রং করত, হাজামরা সুন্নত করাত, দরজি কাপড় সেলাই করত, নেয়াল (মশারীর একজাতীয় ফিতে) বুনত বেনটারা। চণ্ডীমঙ্গলে মুকুন্দের বর্ণনা অনুসারে গুজরাট নগর পত্তনে জনবিন্যাসে হিন্দু-মুসলমান সহাবস্থানের সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়। আসলে মুকুন্দ চক্রবর্তী একটি আদর্শ সমাজ গঠনের স্বপ্নে বিভোর ছিলেন, তাই কালকেতুর গুজরাট নগরে হিন্দুর পাশাপাশি মুসলমানগণ স্বতন্ত্র হাসনহাটি গ্রাম স্থাপন করে বসতি স্থাপন করে। দ্বিজ মাধবের কাব্যেও এই কথা পাই—

"বৈসয়ে মুসলমান পঢ়ে কিতাপ কোরান
নমায়াজ পঢ়ে পাঁচবার।
সোলেমানী মালা করে খোদার নামে জিগির কাঢ়ে
সৈদ কাজী বোসিল অপার॥" (দ্বিজ মাধব/৬৮)

কালকেতুর গুজরাট নগরের মুসলমান প্রজারা ধর্মপরায়ণ, তারা আপন আপন ধর্মাচরণ নিয়েই থাকে। কবিকঙ্কণের কাব্যে মুসলমান সমাজ সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা রোজ ভোর বেলা উঠে পাঁচ ওয়াক্ত নমাজ পড়ে, সোলেমানি মালা জপে, পীরের মাজারে বাতি জ্বালে, সিরনী বাঁটে, নিয়মিত রোজা করে, কোরাণ পাঠ করে। মোল্লারা বিবাহ বা নিকাহ দেয়,তাদের ধর্মীয় প্রভাবের কারণে মুসলমান সমাজে তারা যথেষ্ট প্রতিপত্তি ভোগ করত। সাধারণ মানুষ তাদের দান- খয়রাত করত। উৎসবে মোল্লারা মুরগী ও বক্‌রী জবাই দিত, বিনিময়ে তারা মাথা অংশটি লাভ করত। তাছাড়া মুসলমান সমাজে শিক্ষার দায়িত্বও তারা পালন করত। ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা বুক আচ্ছাদিত করে দাড়ি রাখত, মাথায় টুপি ব্যবহার করত, নারীগণ বোরখা, ইজার পরিধান করে চলাফেরা করত। ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে এসে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ধীরে ধীরে দানা বাঁধতে শুরু করেছিল। চর্তুদশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের কাছে অসহিষ্ণু ছিল, কিন্তু বাংলাদেশে দীর্ঘকাল পাশাপাশি বসবাসের ফলে তারা ধীরে ধীরে সহিষ্ণু মনোভাব পোষণ করতে থাকে। সমকালীন অন্যান্য সাহিত্যে ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর এই মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গলে সমকালের সমাজ ইতিহাসের এই প্রসঙ্গগুলিই কম বেশী মূর্ত হয়ে উঠেছে। মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থায় ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর সমাজ জীবনে হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, দৈবজ্ঞ, ওঝা, বৈদ্য, সমাজপতিদের যেমন যথেষ্ঠ প্রভাব ছিল, ঠিক তেমনি মুসলমান সমাজে কাজী, গাজী, মোল্লা, পীর, সৈয়দদের প্রভাব ছিল। অনেকক্ষেত্রে পরধর্ম বিদ্বেষী তো বটেই আপন প্রভাববশত তারা সমাজে নানান অপকর্ম ও কুকর্ম করত। হিন্দুরা মুসলমানদের ধর্মকর্ম, আচার-আচরণ, এমন কি আহার-বিহারের প্রতিও কটাক্ষ করত। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কবি অসম্প্রদায়িক মনোভাবে মুসলমানদের অনাচার ও অধর্মের নিন্দা করেছেন, অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছেন। ভাঁড়ু দত্তের মত মানুষরা আপন প্রতিপত্তিবশত সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার করত। আবার মুকুন্দ মূর্খ বিপ্রদের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন— তারা ভিক্ষা করে, শ্রাদ্ধশান্তি করে, যজমানের কাছে বলপূর্বক দক্ষিণা আদায় করে। কবিকঙ্কণ লিখেছেন—

"গুজরাট নগরে নগরিয়া শ্রাদ্ধ করে

গ্রামযাজি হয় অধিষ্ঠান।

সাঙ্গ করি দ্বিজে কয় কাহন দক্ষিণা হয়

হাতে কুশে দক্ষিণা ফুরাণ॥" (মুকুন্দ/৬৯)[১৪৪]

সাধারণ মানুষের গ্রামীণ সমাজের রূপটি চণ্ডীমঙ্গলের কবিগণ সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। উচ্চবর্ণের মানুষরা বংশগৌরব এবং উচ্চবর্ণের সমাজে জন্মগ্রহণ করার জন্য অহংকার ও গৌরব বোধ করত। বংশমর্যাদা ও সম্মান নিয়ে পল্লীসমাজে বিভিন্ন উপলক্ষে সমবেত ব্যক্তিদের মধ্যে রীতিমত লড়াই হত। কবিকঙ্কণের কাব্যে ধনপতির পিতৃশ্রাদ্ধে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে রীতিমত মর্যাদার লড়াই হয়, তারা একে অপরের বিরুদ্ধে কুরুচিকর গ্রাম্য দলাদলি ও বচসা-বিবাদ করে। ভাঁড়ু দত্তের মধ্যে এমনিতর মনোভাব দেখি। শঠ এবং অনাচারী হলেও নিজের বংশমর্যাদা সম্পর্কে সে সগর্ব উক্তি করে। শুধু তাই নয়, উচ্চবংশীয় কন্যার পাণিগ্রহণ, উচ্চবংশে কন্যা সম্প্রদান, উচ্চবংশীয় কুলীন ব্যক্তিদের নিজ গৃহে আহার করানো মর্যাদাকর বলে গণ্য হত। ভাঁড়ু দত্ত কালকেতুকে নিজ পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছে-

"যতেক কায়স্থ দেহ ভাঁড়ুর পশ্চাতে লেখ

কুল শীল বিচার মহত্বে।

কহি আপনার তত্ত্ব আমলহাঁড়ার দত্ত

তিন কুলে আমার মিলন।

ঘোষ ও বসুর কন্যা দুই নারী মোর ধন্যা

মিত্রে কৈল কন্যার গ্রহণ॥

গঙ্গার দুকূল পাশে যতেক কায়স্থ বসে

মোর ঘরে করয়ে ভোজন॥" (ঐ/৬৭)[১৪৫]

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে খুল্লনার পরীক্ষা প্রদান উপলক্ষে সমবেত গ্রাম্য সমাজপতিদের কথোপকথনে যে গ্রাম্য দলাদলি ও নিম্নরুচির পরিচয় পাওয়া যায় তা সমাজ ইতিহাসে বাস্তব তথ্যসম্মত। সাধারণত ব্রাহ্মণগণ অন্য সম্প্রদায়ের ঘরে অন্নগ্রহণ করত না, তা নিয়েও সমাজে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হত। খুল্লনার পরীক্ষাদানের সময়ে গ্রাম্য সমাজপতিদের বাস্তব ছবি পাই। এযুগে অর্থ কৌলীন্যের জোরে সমাজে কৌলীন্য প্রাপ্তি ঘটেছিল, বিশেষতঃ বণিক সম্প্রদায় অর্থ কৌলীন্যের জন্য সমাজে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। একারণে প্রতিটি মঙ্গলকাব্যেই প্রায় বণিক সম্প্রদায়ের আধিপত্য, এবং দেবী স্বয়ং প্রতিষ্ঠার জন্য বণিক সম্প্রদায়কে বেছে নিয়েছে। গ্রামীণ সমাজ খুল্লনার পরীক্ষা নিতে চাইলে ধনপতি অর্থ দিয়ে সমাজের মুখ বন্ধ করতে চায়। ধনপতি খুল্লনাকে বোঝায়—

"তোরে বলি প্রিয়ে বসে থাক গৃহে

পরীক্ষায় নাহি কাজ।

ঠেকিলে পরীক্ষে না দেখিব চক্ষে

ভুবন ভরিবে লাজ॥

.. ..

দূর কর শঙ্কা দিব লক্ষ তঙ্কা

বান্ধবে করিব বশ।

আর যে বিপক্ষ তারে দিব লক্ষ

ধন থাকে দিন দশ॥"(ঐ/১৪৩-১৪৪) [১৪৬]

কবি কঙ্কণের পূর্ববর্তী কবি মানিক দত্তের কাব্যেও অনুরূপ তথ্য পাওয়া গিয়েছে, যেমন—

"সাধু বলে পরীক্ষাএ কোন প্রয়োজন।
লক্ষ তঙ্কা পাইলে জ্ঞাতি করিবে ভোজন॥" (মানিক/২৪৯)

বস্তুতপক্ষে অর্থ কৌলীন্যের বলেই বণিক হলেও গ্রামীণ সমাজে ধনপতির প্রতিষ্ঠা ছিল। ব্রাহ্মণরা ধনপতির গৃহে অন্নগ্রহণ করত। খুল্লনার দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তব; সে অর্থগৃধ্নু সমাজপতিদের স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে অবহিত ছিল, তাই সে পরীক্ষা দ্বারা সতীত্ব প্রমাণ করতে চেয়েছিল। কেননা সে জানত-

"অবধান প্রাণনাথ বলি হে তোমারে।
আজি ধন দিলে দিবে বৎসরে বৎসরে॥
নিজ ধন দিতে দিতে তুমি হবে রঙ্ক।
ভুবন ভরিয়া মোর রহিবে কলঙ্ক।"(মুকুন্দ/১৪৪)[১৪৭]

মুসলমান সমাজেও মৌলবী, মোল্লা ও কাজীদের ভণ্ডামীর পরিচয় পাওয়া যায়। মনসামঙ্গলে মুসলমান কাজীদের ভণ্ডামীর পরিচয় আছে। তারা সাধারণ মানুষের প্রতি সুবিচার করত না। মুসলমানরা অনাচারী ছিল তাই খাবার পর কাপড়ে হাত মুছত। মৌলবী, মোল্লারা একাধিক বিবাহ করত; শুধু তাই নয়, তারা অর্থগৃধ্নু বলে সাধারণ মানুষের কাছে মুরগী জবাই করে কড়ি এবং বক্‌রী জবাই করে তার মাথা অংশ আদায় করে নিত—

"করে ধরি খর ছুরী মুরগী জবাই করি
দশগণ্ডা দান পায় কড়ি।
বখরী জবাই যথা মোল্লারে দেহ মাথা
দান পায় কড়ি ছয় বুড়ি॥" (ঐ/৬৮)[১৪৮]

মধ্যযুগের অন্যান্য সাহিত্য শাখাগুলিতে হিন্দু-মুসলমান সমাজের এমনিতর নানা অপকর্ম ও নিম্নরুচির পরিচয় আছে।

নগর পরিকল্পনা ঃ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বাঙালীর গৃহনির্মাণ পদ্ধতি সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। মঙ্গলকাব্যে দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা নির্মিত সুরম্য পুরীর কথা পাওয়া গেলেও বাস্তবে তা মাটির তৈরী বাড়ি মাত্র। বাঙালীর বাড়িঘর তৈরী হত সাধারণত কাদামাটি, বাঁশ, কাঠ, খড়, দড়ি ইত্যাদি দিয়ে। তার সঙ্গে পাথর ও ইট দিয়ে ধনীরা বাড়ি তৈরী করত। উপরে ছাউনি চালা হিসাবে থাকত সাধারণত খড়, ছন ইত্যাদি। কবিকঙ্কণ 'কালকেতুর গৃহনির্ম্মাণ' অংশে গুজরাট নগরে গৃহনির্মাণের বর্ণনা করেছেন—

"বীরের তুলিতে ঘর হয়ে সাবধান॥
আওয়াস তুলিল এক ক্রোশ পরিমাণ।
আপনি কোদালি ধরে বীর হনুমান॥
.....
কাদা তুলে দিল বীর শুভক্ষণ বেলা।
পোয়ালকূড় সম হনুমান তোলে ঢেলা॥
এমন প্রাচীর দিল হৈল চারি পাট।
বাউটি পাথর তায় দিল ঝনঝাট॥
তাল তরু সম উচ্চ করিল প্রাচীর।
পাথরের দাঁত্যা দিল হনুমান বীর॥
মুড়লী রচিয়া তথি আরোপিলা কাট।
চারি হালা খড়ে বিশাই ছায় চারি পাট॥

পুরীর ভিতরে রচে চারি চতুঃশালা।
মাঝে আড়চাল পিঁড়া বান্ধে দিয়া শিলা॥" (ঐ/৬২)[১৪৯]

কালকেতুর পূর্ব বাসস্থান তৈরী হয়েছিল 'নাড়া' দিয়ে অর্থাৎ ধান কাটার পর মাঠে পরিত্যক্ত ধান গাছের কাণ্ড দিয়ে। সাধারণ দরিদ্র মানুষের গৃহনির্মাণ হত সাধারণ ভাবে।তাদের থাকত একটি বা দুটি ঘর। কালকেতু গৃহনির্মাণকালে 'নাড়া'র কুঁড়েঘর ভেঙে কোঠাবাড়ি তৈরী করে- "ভাঙ্গিয়া ফেলিল মহাবীর নাড়ার কুড়ীয়া।" (মানিক/১১৭)। কালকেতুর পুরী নির্মাণ আসলে সম্পন্ন গৃহস্থের গৃহনির্মাণ, যেখানে আছে আশঘর, পাশঘর, শয়নঘর, ভাণ্ডারঘর, রন্ধনশালা, দেবগৃহ ইত্যাদি। অতিথি অভ্যাগতদের জন্য অন্তঃপুরের বাহিরে পৃথক ঘর থাকত। প্রতিটি ঘরে পিড়াঁ বা বারান্দা থাকত; আড়চাল দিয়ে মূল গৃহের সংলগ্ন বারান্দা নির্মিত হত। মানিক দত্তের কাব্যে কালকেতুর গৃহনির্মাণে বিভিন্ন প্রকার ঘরের কথা পাই—

"গহীন ২ বীর গহীন কৈল বাড়ি।
দুই পহরের পথে কাশের কড়কড়ি॥
বাড়ি বেড়িয়া বান্ধে বীর একশত ঘর।
য়ওারি চৌয়ারি বান্ধে উত্তরা মহল॥
আশ ঘর পাশ ঘর শয়ন মন্দির।
ভাণ্ডারিয়ার বাসা বান্ধে অন্তঃপুরীর বাহির॥" (মানিক/১১৮)

ধনী ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির গৃহে, জমিদার বাড়িতে পৃথক মন্ত্রণা কক্ষ বা দেওয়ানি কক্ষ থাকত। মানিক দত্ত লিখেছেন—

"দেওানি করিতে টঙ্গ বান্ধে ভালমতে। (ঐ)

দেবগৃহ বা মন্দির, পুকুর ইত্যাদি বাঙালীর মূল বাসস্থানের একটি সম্পৃক্ত অঙ্গ হিসাবে নির্মিত হত। যেমন—

"বান্ধিল দেহরা ঘর পুরীর ভিতরে।
বলি দিয়া করে পূজা শনি মঙ্গল বারে॥" (ঐ)

কিংবা—

"সপ্তম মহলে তোলে চণ্ডীর দেউল।
নানাচিত্র লিখে বিশাই হয়ে অনুকূল॥" (মুকুন্দ/৬২)[১৫০]

স্নান ও গৃহস্থালীর কার্যে ব্যবহারের জন্য মূল অন্তঃপুরের সঙ্গে পুকুর থাকত, পুকুরে শান বাঁধানো ঘাট তৈরী করা হত—

"অন্তঃপুরে সরোবর করিল নির্ম্মাণ।
পাষাণে বান্ধিল তার ঘাট চারিখান॥" (ঐ)[১৫১]

মূল অন্তঃপুর প্রাচীর ঘেরা থাকত এবং বাইরে যাবার জন্য সিংহদুয়ার ছাড়াও ছোট ছোট দুয়ার থাকত। প্রতিটি দুয়ারে দ্বারী থাকত। ধনী গৃহে অন্তঃপুরের বাইরে পাঠশালা থাকত, সেখানে গৃহের শিশুরা পড়াশুনা করত। মানিক দত্ত এবং মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যে এরূপ বর্ণনা পাই—

"উত্তরে খিড়কী সিংহদ্বার পূর্ব্বদেশে।
পাষাণে রচিত পাঠশালা চারিপাশে॥"(ঐ)[১৫২]

অন্তঃপুরে কঠোর নিরাপত্তা রক্ষিত হত, বিনা অনুমতিতে কেউ অন্তঃপুরে যেতে পারত না—

"চারিদ্বারে রাখে বীর চারিটা জে দ্বারী।
বিনা হুকুমেত কেহ না জাএ তার পুরি॥" (মানিক/১১৮)

চণ্ডীমঙ্গলে গৃহনির্মাণের পাশাপাশি নগর নির্মাণের চিত্রও পাওয়া যায়। নিরাপত্তার জন্য নগর নির্মাণের সময় এলাকার চারিদিকে জাঙ্গাল বা বাঁধ দেওয়া হত, যেমন মানিক দত্তের বর্ণনায়— "উত্তর দক্ষিনে বীর দিলেন জাঙ্গাল।"(মানিক/১১৭)। কালকেতুর গুজরাট নগরের চারিদিকে উঁচু প্রাচীর এবং প্রবেশ দ্বারে কবাট লাগানো ছিল। নগরে প্রতিটি সম্প্রদায়ের বসবাসের জন্য সুব্যবস্থা থাকত।হিন্দুসমাজের ব্যবহার্য দুর্গা মন্দির, নাটশালা, জলাশয়, পাঠশালা, প্রতিটি গৃহে কূপের ব্যবস্থা, স্ত্রীলোকের ব্যবহার্য নাছদুয়ার, জলটুঙ্গি, কুমারের বাসস্থানে পোয়ান থাকত। মুসলমান প্রধান অঞ্চলে নমাজ গৃহ, মসজিদ থাকত। কবির বর্ণনানুসারে—

"চারি চৌরী চতুঃশালা মাঝে পিঁড়ে কাঁচ ঢালা
পাষাণে রচিল নাছ বাট।
নির্ম্মাণ করয়ে তথি রূপে জিনি দ্বারাবতী
পাঠশালা পুরট কবাট॥
.. ..
পশ্চিমদিগেতে সেহ তুলিন নমাজ গৃহ
দলিজ মস্জিদ নানা ছান্দে॥" (মুকুন্দ/৬৩)[২৩]

নগররে অভ্যন্তরে থাকত হাট বা বাজার, যেখানে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বেচাকেনা হত। হাটের বিভিন্ন ভাগে বিভিন্ন রকম দ্রব্য বেচাকেনা করা হত। দ্বিজ মাধবের কাব্যে 'ভাঁড়ুর বেসাতি' অংশে বাজার ব্যবস্থার চিত্র আছে। মানিক দত্তের কাব্যেও হাট বসার কথা পাই। হাটের একেকটি অংশের নাম হত একেক রকম, যেমন— গোহাটা, মোদকি হাটা, কামার হাটা, চাল হাটা, মাছ হাটা, ইত্যাদি। মানিক দত্তের কাব্যে তিয়র হাটের কথা পাই। তিয়র বর্তমানে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় অবস্থিত (বালুরঘাট শহর থেকে ১০-১২ কিলোমিটার)। কবির বর্ণনানুসারে-

"মোদকি হাটা হালুই হাটা খাজা কাটে জারা।
পুড়ি হাটা কুড়ি হাটা খিড়া বেচে তারা॥
কামার হাটা বসি গেল কোদালি ফাল গড়ে।
হাড়ি পাতিল বেচে কুমারের বাজারে॥
.. ..
তিয়র হাট বসি গেল বাজারে বেচে ছাচ।
চাড়াল হাটা মাছুয়া হাটা বাজার বেচে মাছ॥" (মানিক/১৩৩)

কালকেতুর গুজরাট নগর স্থাপনের মধ্যে দিয়ে মধ্যযুগের সমাজ ইতিহাসে নগর পরিকল্পনা সম্পর্কে জানা যায়।

রাজনৈতিক চালচিত্র ঃ মঙ্গলকাব্যগুলি রাজনৈতিক তথ্যসমৃদ্ধ কাব্য নয়;তবু চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে সমকালের রাজনৈতিক পটভূমি এবং রাজনৈতিক জীবনের ছায়াপাত লক্ষ করা যায়। কবিগণ স্বীয় অভিজ্ঞতা অনুসারে রাজনৈতিক ঘটনা এবং তৎকালীন শাসনপ্রণালীর বর্ণনা দিয়েছেন। মঙ্গলকাব্যের কবিগণ ধর্মের অলৌকিক গণ্ডীর মধ্যে বিচরণ করলেও তার মধ্যে থেকেই সেদিনের রাজনৈতিক পটভূমি বুঝে নিতে খুব অসুবিধা হয় না। বখ্‌তিয়ার খিলজীর বঙ্গদেশ বিজয়ের পর বাংলায় মুসলমান শাসনের সূত্রপাত হল; এরপর প্রায় তিন'শ বছর এদেশ তুর্কী-আফগানদের দ্বারা শাসিত হয়। মধ্যবর্তী পর্যায়ের একমাত্র এদেশীয় হিন্দু শাসকরা হলেন রাজা গণেশ ও তাঁর উত্তরাধিকারীগণ।[২২] ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে হুসেনশাহী বংশ প্রতিষ্ঠিত হলে এদেশীয় শাসনব্যবস্থায় স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। দিল্লীতে মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর বাংলার শাসনব্যবস্থায় তার কোন স্থায়ী প্রভাব পড়েনি। আকবরের শাসনকালে ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে দাউদ খাঁ কররানি আকবরের সেনাবাহিনীর কাছে পরাজিত ও মৃত্যুবরণ করলে বাংলায় আফগান শাসনের অবসান ঘটে এবং মোগল আধিপত্য শুরু হয়; কিন্তু ১৫৭৬-১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত

অর্থাৎ মানসিংহের এদেশে আগমনের পূর্ব পর্যন্ত বাংলায় শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়নি।[২৩] ১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দে মানসিংহ বাংলার সুবাদার হলে অশান্ত বাংলাদেশে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে মোগল অধিকৃত অঞ্চলে বারভূইঞাগণ বিক্ষিপ্ত ভাবে অধিকার কায়েম করেছিল।[২৪] মানসিংহ বাংলার সুবাদার হয়ে এলে এদেশে শাসনব্যবস্থায় দুঃসময়ের অবসান ঘটতে থাকে। মুকুন্দ চক্রবর্তীর মুখে তাই মানসিংহের প্রশংসা শোনা যায়—

"ধন্য রাজা মানসিংহ বিষ্ণুপদাম্বুজ-ভৃঙ্গ
গৌড়-বঙ্গ-উৎকল-অধিপ।"(মুকুন্দ/৩)[২৪]

আকবরের রাজত্বকালের প্রথম উনিশ বছর বাংলার জনগণ রাজকর্মচারীদের দ্বারা নানাভাবে লাঞ্ছিত হচ্ছিল, তাই কবি আকবরের প্রশংসা করেননি। মানসিংহের বাংলায় আগমনেই বাংলায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। মুকুন্দের প্রায় সমকালের অপর কবি দ্বিজ মাধব কিন্তু তাঁর 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত' কাব্যে আকবরের যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন। মুহম্মদ আবদুল জলিল দ্বিজ মাধবের এই আকবর প্রশংসার কারণ অনুসন্ধান করে বলেছেন[২৫]— প্রথমত ঃ কবির কাব্যরচনা কালে মোগল শাসকদের দুঃশাসনে সমাজ মানস অস্থির হয়ে ওঠেনি। দ্বিতীয়ত ঃ কবি যে অঞ্চলের মানুষ সে অঞ্চলে হয়ত মোগল শাসকের অত্যাচার ছিল না।

আকবরের রাজত্বকালের প্রথম উনিশ বছর (১৫৭৬-১৫৯৪ খ্রীঃ) বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা ভাল ছিল না। ইতিহাসে তার বহুল প্রমাণ আছে। এই পর্বে অন্তত সাত জন সুবাদার বাংলায় এসেছিলেন, এঁদের শাসনকাল ছিল গড়ে দুই থেকে তিন বছর। ঘন ঘন শাসক পরিবর্তনে.স্থিতিশীলতার অভাব ঘটে এবং দূরত্বের কারণেও সম্রাট একজন শাসককে দীর্ঘদিন বাংলায় রাখতে সাহস পাননি। আকবর জীবনের শেষ পর্বে এসে মানসিংহকে বাংলার সুবাদার করে পাঠান। সুতরাং মানসিংহের বঙ্গদেশে আগমনের প্রাক্কালে এদেশে মানুষ শাসকের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল।[২৬] সুতরাং অত্যাচারী শাসক ডিহিদার মামুদ শরীফের নামের সঙ্গে মানসিংহের নামও যুক্ত হয়ে যায়-
—

" সে মানসিংহের কালে প্রজার পাপের ফলে
ডিহিদার মামুদ সরিপ॥ "(ঐ)[২৫]

কবি মুকুন্দ চক্রবর্তীর তথ্যানুযায়ী, তিনি গোপীনাথ নন্দীর তালুকে বসবাস করতেন। গোপীনাথ নন্দীর মত সজ্জন ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে বন্দি করা হয়। হয়ত মুসলমান ডিহিদার মামুদ শরীফের হিন্দু প্রজা হিতৈষী গোপীনাথ নন্দীকে ভাল লাগেনি, তাই অন্যায় বিপাকে তাকে বন্দি করা হল। মামুদ শরীফের অধীনস্থ কর্মচারীদের হাত থেকে কেউ রেহাই পায়নি, তাই কবি এমতাবস্থায় দেশ ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। চণ্ডীবাটী গ্রামের শ্রীমন্ত খাঁয়ের পরামর্শে কবি দেশত্যাগ করেন। সে সময়ে প্রজারা কিভাবে উৎপীড়িত হত তার তথ্যচিত্র কবি তুলে ধরেছেন—

"উজীর হলো রায়জাদা বেপারিয়ে দেয় খেদা
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হল অরি।
মাপে কোণে দিয়া দড়া পোনের কাঠায় কুড়া
নাহি মানে প্রজার গোহারি।
সরকার হৈল কাল বিলভূমি লিখে মাল
বিনা উপকারে খায় খতি।
পোদ্দার হইল যম টাকা আড়াই আনা কম
পাই লভ্য লয় দিনপ্রতি॥" (ঐ)[২৬]

এরূপ অত্যাচারের হাত থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার জন্য প্রজারা ভিটেমাটি বিক্রি করে অন্যত্র পালিয়ে যেতে থাকে। কিন্তু পালিয়ে যাওয়া সহজ ছিল না, কারণ যাতে প্রজারা পালাতে না পারে এজন্য পেয়াদা পাহারা দিত।

অপরদিকে অন্যায় খাজনা পরিশোধ করতে হত, তাই টাকার দ্রব্য দশ আনায় বিক্রি করতে প্রজারা বাধ্য হত। শুধু কি তাই, সকলেই কেবল বিক্রি করতে চায় কিন্তু ধান, গরু, বাছুর, কেনার মত লোকের অভাব ছিল। কবির প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী—

"ডিহিদার আবোধ খোজ টাকা দিলে নাহি রোজ
ধান্য গরু কেহ নাহি কেনে।
.. ..
পেয়াদা সভার নাছে প্রজারা পলায় পাছে
দুয়ার জুড়িয়া দেয় থানা॥
প্রজারা ব্যাকুলচিত্ত বেচে ধান্য গরু নিত্য
টাকার দ্রব্য হয় দশ আনা॥"(ঐ/৩-৪)[২৫]

বলাই বাহুল্য কবি এই অত্যাচারের শিকার, এবং কবি অশেষ দুঃখকষ্ট ভোগ করে আড়রায় বাঁকুড়া রায়ের জমিদারীতে উপস্থিত হন। বাংলা সম্পর্কিত এরূপ বাস্তব তথ্য সম্পর্কে ডঃ এম. এ. রহিম বলেছেন—"আকবরের রাজত্বকালে উত্তর-পশ্চিম বঙ্গের অংশমাত্র মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং সমগ্র পূর্ব বঙ্গ বারভূইঞা নামে পরিচিত জমিদারদের অধীনে ছিল। ১৫৮৮ খ্রিষ্টাব্দে টোডরমল যখন তাঁর বিখ্যাত রাজস্ব বন্দোবস্ত প্রচলন করেন এবং সাম্রাজ্যের সুবাসমূহের রাজস্ব তালিকা তৈরি করেন, তখন পূর্ব বঙ্গ এমন কি উত্তর-পশ্চিম বাংলাও অশান্ত অবস্থায় ছিল।"[২৭] অতঃপর বাংলার ইতিহাস সম্পর্কিত কবি প্রদত্ত তথ্যের পরিচয় নেওয়া যাক ঃ

১।ডিহিদার ঃ ডিহি অর্থাৎ গ্রাম; ডিহিদার গ্রামের প্রধান বা অঞ্চল প্রধান। গ্রামের রাজস্ব আদায় থেকে প্রশাসনিক দায়িত্ব সবই ডিহিদার বা অঞ্চল প্রধানের উপর ন্যস্ত থাকত, এবং এলাকায় খুন খারাবি হলে, চুরি-ডাকাতি হলে তাকেই কৈফিয়ত দিতে হত।'Provincial Govt. of the Mughals' গ্রন্থের লেখক সরণ (Saran) লিখেছেন-—"The Mughal and the earlier Muslim rulers used the headman of the old village community as'not only an agent for revenue realisation, but also used him officially responsible for policing the rural areas"[২৮] কবিকঙ্কণের তথ্য অনুযায়ী ডিহিদার মামুদ শরীফকে টাকা দিয়ে সন্তুষ্ট করা যায়নি। নতুন পদাধিকার ও উপরওয়ালাদের কঠোর দৃষ্টি এর কারণ হতে পারে।

২।উজির হল্য রায়জাদা ঃ সুবাদারের পরেই সর্বোচ্চ পদাধিকারী ব্যক্তি উজীর; সে রাজ্যের আয়-ব্যয় ও প্রশাসনের দায়িত্বে থাকত। আসলে উজীর দেওয়ান শব্দের প্রতিশব্দ। ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দের পর উজীর পদের প্রবর্তন হয়েছিল। পত্রদাস নামে এক ব্যক্তি 'রায়রাঁয়া' খেতাব নিয়ে টোডরমলের সঙ্গে বাংলায় আসেন এবং কিছু দিন পরে আবার ফিরে যান। মানসিংহের সময়ে পত্রদাস আবার বাংলায় আসেন এবং ১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা, উড়িষ্যার সুবাদার হয়ে টোডরমলের নতুন বিধান প্রবর্তন করেন।পত্রদাস খুব খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন এবং তার পুত্র কিসু দাস রায়জাদা হলেন।[২৯]

৩।পনের কাঠায় কুড়া ঃ কুড়া শব্দের অর্থ বিঘা, জমি পরিমাপের একক। প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী কুড়ি কাঠায় এক বিঘা। কিন্তু টোডরমল প্রবর্তিত নতুন নিয়মে পনের কাঠায় এক বিঘা হল। কারণ পূর্বেকার ইস্কিন্দারী গজ অপেক্ষা টোডরমলের ইলাহী গজ প্রায় এক আঙুল কম। আইন-ই-আকবরী অনুসারে—"Akbar in his wisdom seeing that the variey of measures was a source of inconvenience to his subjects and regarding it as subservient only to the dishonest, abolished them all and bought a medium gaz of 41 digits into general use."[৩০]

৪।খিল ভূমি লেখে লাল ঃ খিল ভূমি অর্থাৎ অনুর্বর পতিত জমি (untilled land) অনুর্বর জমিকে উর্বর জমি

লেখা হল। কারণ, উর্বর জমির রাজস্ব বেশী, বেশী রাজস্ব আদায়ের জন্য এই ব্যবস্থা। আকবরনামা অনুযায়ী জমিতে যাতে ভালো ফসল উৎপন্ন হয় এবিষয়ে আকবরের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। অনাবাদী ফেলে না রেখে যাতে চাষীরা ফসল ফলায় তার জন্য এই ব্যবস্থা।[৩১]

৫।টাকা আড়াই আনা কম ঃ আফগান আমলের টাকার ধাতব মান নতুন মুদ্রা থেকে কমে যায়; অর্থাৎ নতুন মুদ্রা ব্যবস্থা চালু হয়, ফলে টাকায় আড়াই আনা বাট্টা দিতে হত। এছাড়া পুরাতন মুদ্রা বদল করে নেওয়ার সময়সীমা অতিক্রান্ত হলে প্রতিদিন এক পাই করে জরিমানা দিতে হত।[৩২]এই আকস্মিক পরিবর্তিত নতুন নিয়মের মুদ্রা ব্যবস্থা প্রজাদের সহসা মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না।

৬।মাপে কোণে দিয়া দড়া ঃ জমির প্রচলিত মাপ পরিবর্তন করে জমির পরিমাপকে কাগজে কলমে বাড়িয়ে দেওয়া হল, ফলে কোণাকোণি মাপে জমি জরিপ হত। বস্তুত এর উদ্দেশ্যও ছিল রাজস্ব বৃদ্ধি করা।[৩৩]

এছাড়া 'বিনা উপকারে খায় ধুতি' অর্থাৎ বিনা কারণে ঘুষ খাওয়া, চড়া হারে সুদ আদায় বীভৎস আকার ধারণ করেছিল, আর সব কিছুর উদ্দেশ্য অধিক রাজস্ব আদায়। ফলে মুকুন্দের মত সাধারণ প্রজাদের ভূমিস্বত্ব বিঘ্নিত হয়েছিল, তারা সাতপুরুষের ভিটেমাটি পরিত্যাগ করে যেতে বাধ্য হয়েছিল। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে মধ্যযুগের ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য জানা যায়। নতুন ভূমি ব্যবস্থায় জমি পরিমাপের নতুন পদ্ধতি চালু হয়, ফলে জমির পরিমাণ কমে যায়, কুড়ি কাঠার বদলে পনের কাঠায় এক বিঘা চিহ্নিত হয় এবং অনুর্বর জমিকে উর্বর বলে রাজস্ব বৃদ্ধি করা হয়। এই নতুন ব্যবস্থা প্রজাদের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি। সেকালে প্রজাদের জমি সরকারি পক্ষ থেকে পাট্টা অর্থাৎ স্থায়ী স্বত্ব করে দেওয়া হত এবং নিশান দিয়ে চিহ্নিত করা হত।

মুকুন্দ চক্রবর্তী প্রজা শোষণের যে চিত্র তুলে ধরেছেন তা ঐতিহাসিক সত্য এবং সবটাই সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার ফল।সাধারণ মানুষের মধ্যে কিছু কিছু ক্ষমতাপ্রিয় মানুষ সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বাহক ছিল, যেমন ভাঁড়ু দত্তের মত মানুষরা। নতুন শাসনব্যবস্থায় রাজা কালকেতুর কাছে থেকে ভাঁড়ু দত্ত সুবিধা মত নিজের জন্য হাল, গরু, বীজ ধান আদায় করে এবং মোড়লি বা মণ্ডলির পদ দাবী করে। বস্তুতপক্ষে স্বৈরাচারী সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কায়েম করে নিজের ধন ভাণ্ডারকে স্ফীত করে তোলার শাসক ভাঁড়ু দত্তের মত ক্ষমতাপ্রিয় ব্যক্তিগণ। ভাঁড়ু দত্ত কালকেতুকে যে পরামর্শ দিয়েছিল তাতে সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার নগ্ন রূপ প্রকাশিত—

"জিনিতে প্রজার মায়া জমি দিবে মাপিয়া
বন্দে বন্দে প্রজা যেন লয়॥
যখন পাকিবে খন্দ পাতিবা বিষম দ্বন্দ্ব
দরিদ্রের ধানে দিবে নাগা।
খাইয়া তোমার ধন না পালায় যেন জন
অবশেষে নাহি পাবে দাগা॥
.. ..
নফরের হাতে খাঁড়া বহুড়ি জনের ভাড়া
পরিণামে দেয় বড় দুঃখ॥" (ঐ/৬৮)[৩৪]

চণ্ডীমঙ্গলের দেবী চণ্ডী মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রতিভূ এবং শাসকের প্রতিরূপ। চণ্ডী কেন্দ্রীয় শাসকের ন্যায় পশুসমাজকে শৃঙ্খলা দেয়, সে সিংহকে পশুরাজ নিযুক্ত করে, এবং অনুরূপভাবে কালকেতু ব্যাধকেও রাজা করে। চণ্ডীমঙ্গলের পশু সমাজ মধ্যযুগীয় নিপীড়িত-অত্যাচারিত-শোষিত জনসমাজ। সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় শাসক বিলাস-ব্যসনে মত্ত থাকে আর কর্মচারীগণ প্রজা শোষণ করে, অত্যাচার করে, কিন্তু বহিঃশত্রুর হাত থেকে প্রজাকে রক্ষা করার চেষ্টা করে না। বিজ্জুবনের পশুরা পশুরাজের কাছে আবেদনে

অভিযোগ জানিয়েছে, তারা রাজ্য পরিত্যাগের কথা বলেছে—

"শুন শুন রায় মাগিয়ে বিদায়
ছাড়িব তোমার বন।
পাত্র অধিকারী না শুনে গোহারি
বিপাকে ত্যাজিব জীবন॥
নারীগণ সঙ্গে থাক লীলা রঙ্গে
না কর দেশের বিচার॥" (ঐ/৪০)[৫৯]

একই চিত্র আমরা পাই দ্বিজ রামদেবের কাব্যে। দ্বিজ রামদেবের কাব্য অনেক পরবর্তীকালে রচিত এ সময় অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজকীয় বিলাস -ব্যসন বেড়ে গিয়েছিল এবং এই অবসরে কার্যত শাসক ক্ষমতাহীন হয়ে পড়েছিল। দ্বিজ রামদেবের কাব্যে কলিঙ্গরাজের এই সামন্ততান্ত্রিক রূপ প্রকাশিত। কবির বর্ণনানুসারে—

"রাজনীতি ছাড়ে যদি কলিঙ্গরাজন।
প্রজাসবে না মানএ কাহার বচন॥
নিশি দিশি বসি রাজা আন নাহি মন।
মহিষী সহিতে রাজা করএ ক্রন্দন॥
যার যেই নীতি ধর্ম্ম ছাড়িল সকল।
বিপ্রগণে ছাড়ে বেদবিধির মঙ্গল॥" (দ্বিজ রামদেব/৩৩)

ফলে শাসকের অগোচরে তার রাজ্যের অভ্যন্তরে অন্য রাজ্য গড়ে ওঠে । 'পশুগণের রোদন' অংশে সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচারের ইঙ্গিত আছে। পশুগণ বীর হলেও কালকেতুর উন্নত যুদ্ধবিদ্যার কাছে তাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হয়।চণ্ডীমঙ্গলের দেবী চণ্ডী বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ্। সে সামন্ততান্ত্রিক কেন্দ্রীয় শাসক; পশুগণ ও কালকেতু উভয়েই তার অনুগত, সুতরাং কালকেতুকে ধন-সম্পদ দিয়ে কলিঙ্গ রাজ্যেই নতুন রাজ্য স্থাপনের অনুমতি দেয়। কলিঙ্গরাজ তার অনুগত হলেও বিভিন্ন বিষয়ে দেবী তার প্রতি সন্তুষ্ট ছিল না, ফলে তার জঙ্গী অনুচরবৃন্দ— মেঘ, বৃষ্টি, বন্যা দিয়ে কলিঙ্গ রাজ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করে কালকেতুর নতুন গুজরাট নগরকে প্রতিষ্ঠা দিল। এভাবে কলিঙ্গ রাজ্যের অংশ ভেঙ্গে নতুন রাজ্য গড়ে উঠল। যেখানে কালকেতু কবির স্বপ্নের আদর্শ রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করল। 'বাংলা সাহিত্যে সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাধারা' গ্রন্থে ডঃ গীতা মুখোপাধ্যায় কালকেতুকে মোগল সম্রাট আকবরের প্রতিরূপ বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি আকবর চরিত্রের গুণাবলী ও দোষত্রুটিগুলি কালকেতুর চরিত্রে লক্ষ করেছেন। বস্তুতপক্ষে গুজরাট নগরে কালকেতু সুশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছিল। বন্যা ও ঝড়ে বিপর্যস্ত প্রজাদের বাড়িঘর, জমিজমা, চাষবাসের অর্থ, বীজ ধান দিয়ে ঘোষণা করল— প্রজাদের তিন সনের কর মকুব করা হবে। বুলান মণ্ডলকে কালকেতু বলেছিল-

"শুন ভাই বুলান মণ্ডল।
আইস আইস আমার পুর সন্তাপ করিব দূর
কানে দিব কনক-কুণ্ডল॥
আমার নগরে বৈস যত ভূমি চাহ চষ
তিন সন বই দিও কর।
হাল পিছে এক তঙ্কা না করো কাহার শঙ্কা
পাট্টায় নিশান মোর ধর॥

খন্দে নাহি নিব বাড়ি রয়ে বসে দিব কড়ি
ডিহিদার না করিব দেশে।
সেলামী কি বাঁশগাড়ী নানা বাবে যত কড়ি
না লইব গুজরাট বাসে॥
পার্ব্বণী পঞ্চক যত গুয়া লোণ সানাভাত
ধানকাটি কলম-কসুরে।
যত বেচ চাল ধান তার না লইব দান
অঙ্ক নাহি বাড়াইব পুরে॥
যত বৈসে দ্বিজবর কারু না লইব কর
চাষীজনে বাড়ি দিব ধান।
হইয়া ব্রাহ্মণ-দাস পূরাব সবার আশ
প্রতি জনে সাধিব সম্মান॥" (মুকুন্দ/৬৭)[১৬০]

সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় অর্থনীতি ছিল সামন্ততান্ত্রিক এবং সামন্ততন্ত্রে ভূস্বামী ও প্রজার সম্পর্ক অনেকটা প্রভু-ভৃত্যের হত। সামন্তরাজ বা জমিদার জমির মালিক, সে যাবতীয় স্বত্ব ভোগ করে থাকে। সম্রাটের কাছ থেকে নির্দিষ্ট পরিমান বার্ষিক রাজস্বের বিনিময়ে সামন্তরাজ জমিদারী সনদ পেয়ে থাকে। প্রজারা জমি চাষ করলেও জমির প্রকৃত মালিক তারা নয়, তাই তাদের জমির অধিকার থাকলেও বিক্রি করার অধিকার ছিল না। এমন কি তারা ইচ্ছে মত জমিদারী পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে যেতে পারত না। মোটের উপর তাদের অবস্থা ভূমিদাসের মতই ছিল।মুকুন্দ চক্রবর্তী দামুন্যাতে ডিহিদারের অত্যাচারে প্রজাদের নাভিশ্বাসের বিবরণ দিয়েছেন কিন্তু অদৃষ্টবাদী কবি শাসকের এই অত্যাচারকে প্রজার পাপের ফল বলে বর্ণনা দিয়েছেন। টোড়রমলের নতুন ভূমি ও মুদ্রা সংস্কার আইনে প্রজার জীবনের স্থিতাবস্থা বিঘ্নিত হয়েছিল, এমতাবস্থায় প্রজারা পালিয়ে বাঁচতে বাধ্য হয়েছিল। কালকেতুর গুজরাট নগর শোষণমুক্ত আদর্শ সমাজ-অর্থনীতির পরিচয় দেয়। বুলান মণ্ডলরা বাস্তব ইতিহাসে কবির স্বগোত্রীয়, কেননা কলিঙ্গ রাজ্যে তাদের অর্থনৈতিক স্থিতাবস্থা নেই। কৃষিজীবী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় প্রজা মুরারী শীলের মত ধূর্ত মহাজন, ভাঁড়ুর মত প্রবঞ্চক মণ্ডলদের দ্বারা শোষিত হত। সমাজের অভ্যন্তরে মহাজনরা সুদে টাকা খাটিয়ে মানুষকে শোষণ করত, তাছাড়া অর্থশালী ব্যক্তিরাও সুদের বিনিময়ে টাকা খাটাত। দ্বিজ রামদেবের কাব্যে দেখি ফুল্লরার সখী তাকে টাকা ধার দিয়েছে সুদের বিনিময়ে এবং নির্দিষ্ট সময়ে পরিশোধ না করায় ফুল্লরাকে ভৎর্সনা করেছে—

সখী জানি কর্জ্জ দিলুম পঞ্চ বুড়ি কৈড়ি।
লাভ দিলা মূলধন নাহি দিলা ফিরি॥" (দ্বিজ রামদেব /৬৫)

অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টিতে ফসল নষ্ট হলে প্রদেয় কর থেকে প্রজার রেহাই ছিল না। তাই প্রজাদের খেদ—

"বিষাদ ভাবিয়া প্রজা করয়ে রোদন।
দুই চক্ষে বহে যেন ধারার শ্রাবণ॥
বুলান মণ্ডল বলে শুন মোর ভাই।
হাজিল ক্ষেতের শস্য তাহে না ডরাই॥
মসীল করিবে রাজা দিয়া হাতে দড়ি।
চাহিয়ে প্রথম মাসে এক তেহাই কড়ি॥"(মুকুন্দ/৬৬)[১৬১]

বুলান মণ্ডল বাস্তবে বঙ্কিমচন্দ্রের পরাণ মণ্ডল ও রামা কৈবর্তদের স্বগোত্রীয়। বন্যা, খরা, মহামারী হলেও রাজস্ব

মকুব করা হত না, বরঞ্চ তিন গুণ বেশী কর দিতে হত। তাই প্রজারা মুকুন্দ চক্রবর্তীর মত শোষণহীন শান্তিপূর্ণ সমাজের আকাঙ্ক্ষা করবে এটাই স্বাভাবিক। কালকেতুর গুজরাট নগর কবির আদর্শায়িত সমাজ হলেও তার বাস্তবতা অস্বীকার করা যায় না। সে এক আদর্শ রাষ্ট্র, যেখানে সকলের সহাবস্থান ও স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্বাহের সুযোগ থাকবে, কর হবে অত্যন্ত কম— হাল পিছু এক টাকা মাত্র এবং তাও প্রতি তিন বছর অন্তর অন্তর দিতে হবে। জমিদার পাট্টার নিশান দিয়ে জমি বিলি বন্দোবস্ত দিলে জমি থেকে প্রজার উচ্ছেদের আশঙ্কা থাকত না। জমিদার আরোপিত বিভিন্ন ধরনের কর প্রজাকে সর্বস্বান্ত করত— সেলামি বা প্রণামী কর, বাঁশগাড়ি বা দখল নেওয়ার সময় জমির উপর পতাকা যুক্ত কঞ্চি পুঁতে দেওয়ার জন্য কর, গুড়া বা গুড় তৈরীর কর, সানাভাত বা 'সানাউত' বা পূর্বেকার মুদ্রা ব্যবহারের জন্য প্রদেয় কর, পার্বণী বা উৎসব কর, পঞ্চক বা পাঁচ জনের বিচার বিভাগীয় কর, ধান্যকাটি কর, বিক্রয় কর, দান কর, লোণা বা লবণ তৈরীর কর, তাছাড়াও স্বত্ব কর, নজরানা ইত্যাদি— আদর্শ রাষ্ট্রে এসব কিছুই থাকবে না। এভাবে মানবতাবাদী কবি মানুষের মূল্য দিলেন, সম্মান দিলেন। তিনি কালকেতুর মুখে ঘোষণা করলেন দেশে ডিহিদার দেবেন না। মানসিংহের আগমনে বাংলার বুকে এই সুন্দর শাসনব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছিল, কবি কালকেতুর রাজ্যে তাকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। সেখানে জাতিভেদহীন, বৈষম্য-বিদ্বেষহীন, শোষণমুক্ত সমাজের স্বপ্ন থাকবে— যেখানে সকল শ্রেণীর মানুষ নির্বিবাদে ধর্মাচরণ করতে পারবে, সে এক সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত সমাজ।বাস্তবে সমাজের অভ্যন্তরে যে কুটিলতা ছিল তা সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া সম্ভব হয়নি, তার প্রমাণ পাওয়া যায় বণিক খণ্ডে খুল্লনার পরীক্ষা অংশে, ভাঁড়ুদত্তের আচরণে। কিন্তু গরীব-দুঃখী প্রজাদের সুখ ও সমৃদ্ধি ছিল। দ্বিজ মাধবের কাব্যে তাই কবি লেখেন—

"দুঃখী দরিদ্র তাতে এক নাহি জানি।
কনক কলসী ভরি প্রজা খায়ে পানি॥"(দ্বিজ মাধব/৬৯)

ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার 'চণ্ডীমঙ্গলের সমাজতাত্বিক সংকেত' প্রবন্ধে মধ্যযুগীয় সমাজ ইতিহাসের এই প্রসঙ্গটিকে সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন— "মধ্যযুগের বিস্তৃত বিচলিত সমাজ পরিবেশ এবং এর সমস্ত ধ্বংসপ্রবণতা-ধর্মী প্রভাবের স্পর্শ থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য এবং সেই পরিবেশে নিজের অকুতোভয় সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মানুষ এই সীমাহীন শক্তির কামনা করেছে। আর, সেই কামনাই বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে চণ্ডীতে ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। সেই ব্যঞ্জনার মধ্যে আমরা লৌকিক জীবনের স্পন্দন অনুভব করেছি। এই কামনা ও কল্পনার মাধ্যমে মানুষ নিজেকে উপলব্ধি করেছে অন্য এক ভাবে, অধ্যাসের রঙীন আলোয় পুনরায় সৃষ্টি করেছে নিজেকে, জীবনের হয়েছে নব রূপায়ণ।"[৩৪]

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে মধ্যযুগীয় বিচার ও শাস্তি ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। চণ্ডীমঙ্গলে কালকেতুর রাজ্যে কিছুটা ন্যায়বিচারের কথা আছে। বস্তুতপক্ষে সাধারণ মানুষের জন্য কোন রকম ন্যায় বিচার ছিল না, মুকুন্দের দেশ ত্যাগই তার প্রমাণ। তবে অন্যায়কারীকে বিভিন্ন রকম শাস্তি দেওয়া হত, তার মধ্যে ছিল কারাবাস, বন্ধন, প্রহার, সম্পদ অপহরণ, শিরচ্ছেদ ইত্যাদি। কালকেতুকে কলিঙ্গ রাজ্যের কারাগারে শিকলে বেঁধে কঠিন পাথর খণ্ড বুকে চাপিয়ে দেওয়া হয়। ধনপতিকে মিথ্যা বলার জন্য বাণিজ্যের সম্পদ অপহরণ ও কারারুদ্ধ করা হয়, একই অপরাধে শ্রীমন্তের শিরচ্ছেদের আয়োজন হয়। সাধারণত অপরাধীকে অনেক সময় মাথা মুড়িয়ে, চুনকালি মাখিয়ে অপমানিত করে বিতাড়িত করা হত। এটা সম্পূর্ণ গ্রামীণ বিচার ব্যবস্থা বলে মনে হয়। মধ্যযুগে গ্রামীণ বিচার ব্যবস্থা ও শাসনকার্য পরিচালনা করত স্থানীয় রাজা বা জমিদার। মামলা-মোকদ্দমা কিংবা সামাজিক ন্যায়-অন্যায়ের বিচার করত গ্রামীণ সমাজপতিগণ। গ্রামীণ সমাজ ঘটিত বিষয়ে অনেক সময় রাজা বা জমিদারের হস্তক্ষেপ থাকত। চণ্ডীমঙ্গলে খুল্লনার শাস্তি বিধান করেছিল সমাজ, সেই অনুসারে খুল্লনার পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়। কবিকঙ্কণের কাব্যে দেখি সমাজপতিদের নির্দেশে খুল্লনার পরীক্ষা হয়েছে, কিন্তু দ্বিজ মাধবের কাব্যে দেখি জ্ঞাতিগণের

নির্দেশে খুল্লনা পরীক্ষা দিতে সম্মত হলেও রাজ আজ্ঞার প্রয়োজন হয়েছে- "সতীত্ব পরীক্ষায় রাজ সম্মতির প্রয়োজন।" (দ্বিজ মাধব/১৮৭) কিন্তু সমাজ ঘটিত ব্যাপারে রাজা হস্তক্ষেপ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে—

"দণ্ডধরে বোলে শুন বণিক-সমাজ।
করাও পরীক্ষা কন্যা যেমতে হয়ে কাজ॥
জাতির উপরে আম্হি নহি অধিকারী.
পরীক্ষা দিয়া শুদ্ধ করাও সুন্দরী॥" (দ্বিজ মাধব/১৮৭)

স্থানীয় বিচার ব্যবস্থায় শাসকের বিচক্ষণতার পরিচয় আছে এখানে। রাজা বা জমিদারগণ যেমন প্রজা কল্যাণের কথা ভাবত তেমনি বিচক্ষণতার পরিচয় দিত। বস্তুত মধ্যযুগে প্রজাহিতৈষী জমিদারের অভাব ছিল না। কালকেতুর রাজত্ব বা রাজ্য আসলে মধ্যযুগীয় আঞ্চলিক শাসকের মত অর্থাৎ জমিদারের মত। মুকুন্দ চক্রবর্তী দামুন্যা ত্যাগ করে আড়রায় ব্রাহ্মণ ভূমিতে আশ্রয় নিলেন। কৃষিনির্ভর কবি এখানে আড়রার ব্রাহ্মণ অধিপতি বাঁকুড়া রায়ের পুত্র রঘুনাথ রায়ের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হলেন, কবি বুদ্ধিজীবী শিক্ষক হলেন। কবি বাঁকুড়া রায়কে রাজা বললেও তিনি জমিদার মাত্র। মধ্যযুগে জমিদারদের রাজার মত মর্যাদা ছিল। এই সময়ে জমিদারদের কাজ ছিল শাসনকার্য পরিচালনা ও রাজস্ব আদায়। জমিদারী উচ্ছেদের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় শাসক বা বাদশাহের হাতে থাকত। নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্বের বিনিময়ে জমিদার বা জমিদারের উত্তরাধিকারীকে বাদশাহের সনদ নিতে হত। জমিদারকে বাদশাহের সঙ্গে সদ্ভাব রেখে চলতে হত।[৫৫] চণ্ডীমঙ্গলে পশুরাজ্য স্থাপন এবং কলিঙ্গ রাজ্য ভেঙ্গে গুজরাট নগর পত্তনে এই সমস্ত ঘটনার প্রতিরূপ সৃষ্টি করেছে বলে মনে করা যায়। মধ্যযুগের জমিদারগণ রাজার মতই ক্ষমতার অধিকারী ছিল। জমিদারী পরিচালনার জন্য তাদের পাইক, পেয়াদা, পাত্র, রাজদূত, মণ্ডল অর্থাৎ শাসনকার্য পরিচালনার জন্য গঠনগত কাঠামো থাকত। দেবী পশুদের রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সিংহকে পশুরাজ, হাতিকে মন্ত্রী, শরভকে কুল পুরোহিত এবং অন্যান্য পশুদের যোগ্যতা অনুসারে পদ দান করে। ঠিক কালকেতুর রাজ্যেও যোগ্যতা অনুসারে পদ দেওয়া হয়। দ্বিজ রামদেবের কাব্যে গুজরাট নগরের শাসন সহায়ক পাত্র, মণ্ডল ইত্যাদি পদের কথা পাওয়া যাচ্ছে। বুড়ন মণ্ডল গুজরাট নগরের মহাজন, কেতু হয় মুখপাত্র ইত্যাদি। কবির বর্ণনানুসারে—

"শুনরে বুড়ন মণ্ডল শুতি আছ কি।
তোর তরে স্বপ্ন কহি হেমন্তের ঝি॥
গ্রামের প্রধান তুম্হি হও মহাজন।
এথাতে রহিয়া প্রজা নাশ কি কারণ॥
গুজরাটে কালকেতু করিছে পত্তন।
তথা গিয়া রহ তুম্হি লইয়া প্রজাগণ॥
কর নাহি দিঅ তথা দ্বাদশ বৎসর।
মুখ্য পাত্র হও তুম্হি কেতু দণ্ডধর॥" (দ্বিজ রামদেব/৭৫-৭৬)

মধ্যযুগে রাজা থেকে জমিদার প্রত্যেকের নিরাপত্তার জন্য সৈন্যবাহিনী রাখতে হত। তাই কালকেতু নগরপত্তনকালে অন্যান্য দ্রব্যের সঙ্গে যুদ্ধাস্ত্রও ক্রয় করেছে। সেখানে হাতি, ঘোড়া, পদাতিক বাহিনী থাকত. মল্ল, পাইক, গুপ্তচর থাকত। 'রাজকুমারের যুদ্ধ গমন' অংশে এরূপ বর্ণনা পাই—

"আগু দলে যুবরাজ ধায় লঘুগতি॥
ডানি দিগে ধাইল কোটাল ভীম মল্ল।
রাজার জামাতা ধায় নামে বীর শল্য॥

.. ..

পথে পথে বিভাগ করিয়া নিল ঠাট॥

চারি দিকে বেড়িল নগর গুজরাট॥"(মুকুন্দ/৭৬)[১৬২]

শত্রুপক্ষের হাত থেকে নগর রক্ষার জন্য নগর নির্মাণকালে নগরের চারিদিকে পরিখা কাটা হত, সেখানে হিংস্র জলজ প্রাণী পালন করা হত। উঁচু প্রাচীর দিয়ে নগর ঘেরা থাকত, সেখানে বিভিন্ন গুপ্ত স্থানে কামান ইত্যাদি যুদ্ধাস্ত্র রাখা হত, পথের মাঝে মাঝে গুপ্ত কূপ খনন করে রাখা হত। দ্বিজ মাধবের কাব্যে কালকেতুর নগর রক্ষার ব্যবস্থায় মধ্যযুগীয় শাসন প্রণালীর নগর রক্ষার বন্দোবস্তের ছবি পাওযা যায়। কবির বর্ণনানুসারে—

"কালকেতু রিপু-সেনা ত্বরিতে জিনিতে।

চণ্ডীপুরে দিয়া থানা কাটিয়া গহন খানা

গড় করিল চারি ভিতে॥

.. ..

রক্ষী থুইল পদাতিকহয় গজ অধিক

বাহিরে সৃজিল সিজগড়া॥" (দ্বিজ মাধব/৬৮)

দ্বিজ রামদেবের কাব্যেও অনুরূপ ব্যবস্থার কথা পাই—

"প্রথমে পরিখা কাটি তুলিল প্রাচীর।

পরিখার জলে খেলে মকর কুম্ভীর॥

চৌদিকে দলদলি কাটি কৈল দুর্গস্থল।

পর্ব্বতিআ নন্দি বান্ধে পূর্ণ করি জল॥

থরে থরে পাতি কথ করিআ সন্ধান।

কোঠের উপরে তোলে বিশাল কামান॥

চণ্ডীপুর করিআ রাখিল এক থানা।

বিপক্ষ আসিতে তার প্রাণে দিতে হানা॥" (দ্বিজ রামদেব/৭৯-৮০)

এই চিত্র মধ্যযুগীয় আবর্তসঙ্কুল রাজনৈতিক পরিবেশের বাস্তব ঐতিহাসিক চিত্র বলে মনে করা যায়।

তখনকার দিনে পথঘাট মোটেই নিরাপদ ছিল না। আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থার দুর্বলতায় শাসনতান্ত্রিক পরিকাঠামো ভেঙ্গে পড়লে দুর্নীতিতে সমাজ ভরে গিয়েছিল। তেমনি জলপথ, স্থলপথ কোনটিই মানুষের কাছে নিরাপদ ছিল না; যদিও দ্বিজ মাধবের কাব্যে কালকেতুর রাজ্যে চোর ডাকাতের উপদ্রব ছিল না বলেই উল্লেখ-

"রাজ-বিঘ্ন নাই তাতে নাই দস্যুভীত।

দুর্গার প্রসাদে লোক থাকে হরষিত॥" (দ্বিজ মাধব/৬৯)

কিন্তু এটা সম্ভবত পরবর্তীকালের কথা। দ্বিজ মাধব ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দে কাব্য রচনা করেন আর ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে আকবরের শাসনকাল শুরু হয়। এর প্রায় সমসাময়িক কালে মুকুন্দ চক্রবর্তী কাব্য রচনা করেন। মুকুন্দের কাব্যে পথেঘাটে চোর, ডাকাত, বাটপার, জলদস্যুদের অত্যাচারের কথা পাই। মুকুন্দের আত্মবিবরণী অনুসারে রূপ রায় কবির সর্বস্ব অপহরণ করে। সম্ভবতঃ রূপ রায় কোন বাটপার দলের সর্দার ছিল। মুকুন্দ চক্রবর্তী লিখেছেন—

"ভাই নহে উপযুক্ত রূপরায় নিল বিত্ত

যদুকুণ্ড তেলি কৈল রক্ষা।" (মুকুন্দ/৪)[১৬৩]

মুকুন্দের কাব্যে আরো পাওয়া যায় পর্তুগীজ জলদস্যু হার্মাদের ভয়ের কথা। ধনপতি 'ফিরাঙ্গির' দেশ রাত্রে অতিক্রম করল হারমাদের ভয়ে—

"ফিরাঙ্গির দেশ খান বাহে কর্ণধারে।

রাত্রি দিন বাহে ডিঙ্গা হারামদের ডরে॥ (ঐ/১৮৮)

পর্তুগীজ জলদস্যু হার্মাদরা জলপথে দিনের বেলায়ও ডাকাতি করত। 'হার্মাদ' শব্দটির প্রকৃত রূপ 'Armada'; স্প্যানিশ আর্মাডার মত নৌবহর। মধ্যযুগের অন্যান্য কাব্যেও পর্তুগীজ জলদস্যুদের অত্যাচারের কথা পাই। রোষাঙ রাজসভার কবি আলাওল বাল্যকালেই পর্তুগীজ জলদস্যু হার্মাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন। স্থলপথে ঠগী পিণ্ডারীদের মত বাটপারের উপদ্রব ছিল। তাছাড়া দেখা যায় দস্যুদের অত্যাচার এত মাত্রাতিরিক্ত ছিল যে সাধারণ মানুষ বিদেশী বা অপরিচিত ব্যক্তিকে বিশ্বাস করত না। শ্রীমন্ত সিংহলে উপনীত হলে তাকে সেখানকার লোকে সহজে বিশ্বাস করেনি—

"সাধু নহ চোর তুই মিথ্যা তোর ভরা।

সাধুরূপে প্রবেশিয়া ডাকা দিবে পারা॥"(ঐ/১৯৪)[১৬৪]

মঙ্গলকাব্যে প্রাপ্ত এই সমস্ত তথ্য তৎকালীন সময়ের বাস্তব যুগচিত্র।

অর্থনৈতিক চালচিত্র ঃ প্রধানত ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর কালপর্বে চণ্ডীমঙ্গলের প্রধান কাব্যগুলি রচিত হয়েছিল সুতরাং ঐ পর্বের রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক চালচিত্র ধরা পড়েছে এখানে। আমাদের মনে রাখা দরকার ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলাদেশ মোগল অধিকৃত এবং সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় অর্থনীতি পরিচালিত। বাংলার এই পর্বের অর্থনীতি প্রধানত কৃষি নির্ভর হলেও শিল্প ও বাণিজ্য অন্যতম দুটি দিক।

মুদ্রা ব্যবস্থা ঃ মোগল আমলের বাংলাদেশে মুদ্রা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। সম্রাট আকবর শেরশাহ প্রচলিত মুদ্রা ব্যবস্থাকেই সর্বত্র কার্যকর করেন এবং ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু পর্যন্ত মোটামুটি ঐ ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল।[৩৬] স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রা মোগল যুগে প্রচলিত থাকলেও সাধারণ মানুষ স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা ব্যবহার করতে পারত না। স্বর্ণমুদ্রাকে বলা হত মোহর। ধনী বা জমিদারদের কাছে মোহর থাকত। দেবী চণ্ডী কালকেতুকে যে সাত ঘড়া ধন দিয়ে ছিল তা বাস্তবে স্বর্ণমুদ্রা বা মোহর। রৌপ্যমুদ্রা হল টাকা বা 'টঙ্ক' বা 'তঙ্কা'। মধ্যযুগে কাগুজে টাকা ছিল না, রৌপ্যমুদ্রাই টাকা নামে প্রচলিত ছিল।[৩৭] চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে টাকার ব্যবহার লক্ষ করা যায়। দ্বিজ মাধবের কাব্যে 'ভাঁড়ুর বেসাতি' অংশে 'তঙ্কা' বা টাকার ব্যবহারের কথা পাই। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে মুরারী শীলের সঙ্গে কালকেতুর অঙ্গুরীয় বিক্রয় প্রসঙ্গে টাকার ব্যবহার আছে—

"সাত কোটি টাকা দেহ অঙ্গুরীর মূল।

দিয়াছেন চণ্ডী বীরে হয়ে অনুকূল॥

অকপটে সাত কোটি টাকা দেহ বীরে।

বাড়িবে তোমার ধন অভয়ার বরে॥" (ঐ/৫৯)[১৬৫]

অন্যান্য চণ্ডীমঙ্গলেও টাকার ব্যবহার দেখা যায়।টাকার পরে মুদ্রার ক্ষুদ্রতম মান হল 'কড়ি'। এগুলি সাধারণত তামার তৈরী হত। দৈনন্দিন জীবনে লেনদেনের মাধ্যম হিসাবে কড়ির ব্যবহারই ছিল বেশী। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধেও কড়ির ব্যবহার হত। লোকে লেনদেনের জন্য 'তঙ্কা' বা টাকা ভেঙ্গে 'কড়ি' করত। দ্বিজ মাধবের কাব্যে 'ভাঁড়ুর কপট বেসাতি' অংশে আছে—

"ভাঙ্গা কড়ি ছয় বুড়ি গামছা বান্ধিয়া।

ছাওয়ালের মাথায় বোঝা দিলেক তুলিয়া।

.. ..

ভাঁড়ু দত্তে বোলে ধনা চাউল দেয় মোরে।

তঙ্কা ভাঙ্গাইয়া কড়ি দিয়া যাইমু তোরে॥"(দ্বিজ মাধব/৭০)

দ্বিজ রামদেবের কাব্যে কড়ির ব্যবহারের কথা আছে। ভাঁড়ু দত্তের উক্তিতে পাই—

"দধিভাণ্ড নেম বিপ্র করাইতে ভোজন।
টঙ্কা ভাঙ্গাইআ কৈড়ি দিমু এহি ক্ষণ॥"(রামদেব/৮৩)

কখনো কখনো বাজারে অপ্রচলিত মুদ্রা বা মেকী মুদ্রাও ব্যবহৃহ হত, তাকে 'কানাকড়ি' বলা হত। দুর্বলা বাজারে রাজভাটকে কৌশলে কানাকড়ি দিয়েছিল—

"ইচ্ছিয়ে তোমার যশ তারে দিনু পণ দশ
কড়ি কাণা পড়িল পণ সাত।" (ঐ/১২৬)

কড়ির মূল্যমান সর্বদা সমান থাকত না। তবে চণ্ডীমঙ্গলে স্থিতিশীল বাজারের পরিচয় আছে 'দুর্বলার হাটে গমন' অংশে। দুর্বলার বাজার করার বিবরণে তৎকালীন সময়ে কড়ির ব্যবহার, মুদ্রামান ও বাজার ব্যবস্থায় দ্রব্যমূল্য সম্পর্কে জানা জানা যায়। সাধারণ মানুষ হিসাব করার জন্য বিভিন্ন গ্রামীণ পরিভাষায় একক ব্যবহার করত। যেমন মুরারী শীল কালকেতুকে অঙ্গুরীর মূল্য, ধারে মাংস ও কাঠের মূল্যসমেত হিসেব দিয়েছে আট পণ আড়াই বুড়ি কড়ি। কবির বিবরণে—

"রতি প্রতি হৈল বীর দশ গণ্ডা দর।
দুধানের কড়ি আর পাঁচ গণ্ডা ধর॥
অষ্টপণ পাঁচ গণ্ডা অঙ্গুরীর কড়ি।
মাংসের পিছিলা বাকী ধারী দেড়বুড়ি॥
একুনে হইল অষ্টপণ আড়াই বুড়ি।
চাল ক্ষুদ কিছু লহ কিছু লহ কড়ি॥" (মুকুন্দ/৫৮)[১৬৬]

বড় একক হিসাবে 'পণ' ও 'কাহন' ব্যবহার করা হত, এবং ছোট একক হিসাবে 'গণ্ডা' ব্যবহৃত হত। ধনপতি দুর্বলাকে বাজার করার জন্য পঞ্চাশ কাহন কড়ি দিয়েছে—

"পাণ দিয়া দুর্ব্বলারে সাধু দিল ভার।
কাহন পঞ্চাশ লয়ে চলহ বাজার॥
কিনিতে তোমার যদি নাহি আঁটে কড়ি।
টাকা দুই চারি লবে বণিকের বাড়ী॥"(ঐ/১২৫)[১৬৭]

সাধারণ মানুষ কড়ির অভাবে দ্রব্য বিনিময় করত। মুরারী শীল কালকেতুর কাছে চাল, ক্ষুদ ইত্যাদির বিনিময়ে মাংস, কাঠ ইত্যাদি সংগ্রহ করত। শুধু মুদ্রা গণনায় নয়, ওজন পরিমাপক এককের কথাও পাওয়া যায় চণ্ডীমঙ্গলে। মূল্যবান ধাতু সোনা, রূপা ইত্যাদির পরিমাপে ক্ষুদ্রতম একক 'রতি' ব্যবহার করা হত। আবার তেল, ঘি. চাল, ডাল ইত্যাদি 'সের' পরিমাপে ওজন করা হত। যেমন দুর্বলার বাজার অংশে—

"চতুর সাধুর দাসী আট কাহনেতে খাসী
তৈল সের দরে দশ বুড়ি।" (ঐ)

কিংবা, দ্বিজ মাধবের কাব্যে ভাঁড়ু দত্তের বেসাতি অংশে—

"এথেক শুনিয়া ভাঁড়ু বসিল চাপিয়া।
সের অষ্ট দশ চাউল লইল মাপিয়া॥" (দ্বিজ মাধব/৭০)

অপেক্ষাকৃত কম ওজনের জন্য পোয়া বা 'পাবা' ব্যবহৃত হত (এক পোয়া এক সেরের চার ভাগের এক ভাগ)। যেমন—

"ক্রোধ না কর ভাঁড়ু মোর দিকে বাহ।

এক পাবা তৈল দেম বাকিতে লইয়া যাহ॥" (ঐ/৭১)

পান-সুপারি ইত্যাদির গণনায় একক হিসাবে 'পণ' ও 'বিড়া' ব্যবহৃত হত। যেমন—

"বারুই বোলে ভাঁড়ু দত্ত আইলা এথায়।
পাঁচ বিড়া পান নেয় কড়ির নাঞি দায়॥" (ঐ/৭২)

অথবা—

"বিশা দরে ছেনা কিনি কিনিল নবাৎ চিনি
গণে পণ-মূলে পাণ নিলে॥" (মুকুন্দ/১২৫)[১৬৮]

কৃষি ঃ মোগল যুগে অর্থনীতির মূল ভিত্তি ছিল কৃষি। শ্রমের বিনিময়ে কৃষি থেকে বিপুল সম্পদ সংগৃহীত হত। অথচ এই কৃষিই আবার শাসক ও শোষিতের সম্পর্কের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। বাংলদেশের ভূমি ছিল অত্যন্ত উর্বর। তাই অল্প শ্রমে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হত। কৃষিজাতদ্রব্যের মধ্যে অন্যতম হল ধান। বাঙালীর প্রধান খাদ্য ভাত, সুতরাং কৃষিজাত ফসলের মধ্যে ধান চাষের গুরুত্ব ছিল সর্বাধিক। বাংলাদেশে বৈচিত্র্যপূর্ণ স্বাদে-গন্ধে ভরপুর বিভিন্ন রকম ধান উৎপন্ন হত, তার পরিচয় মঙ্গলকাব্যগুলিতে পাওয়া যায়। ধান ছাড়াও গম, পাট, কার্পাস, আখ; বিভিন্ন প্রকার ডাল, যথা— মুগ, মসুর, মাষ ইত্যাদি চাষ হত। মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যে মেনকা শিবঠাকুরকে অলস ও কর্মকুন্ঠ বলে তিরস্কার করলে গৌরী জানায়—

"জামাতারে বাপ মোর দিল ভূমিদান।
তথি ফলে মসুর কাপাস মাষ ধান॥" (ঐ/২২)[১৬৯]

বাংলার ভূমিতে প্রচুর কার্পাস উৎপন্ন হত, সাধারণ মানুষ ডোল ভর্তি করে কার্পাস রাখত। কবিকঙ্কণের কাব্যে তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়—

"দেশমুখ বলে ভাই শুন মোর বোল।
স্রোতে ভেসে গেল মোর কাপাসের ডোল॥" (মুকুন্দ/৬৬)[১৭০]

বাংলাদেশে প্রচুর পরিমানে বিভিন্ন প্রকার মসলা— জয়িত্রী, হলুদ, আদা, জিরা, লবঙ্গ, তেজপাতা, রসুন, মরিচ উৎপন্ন হত; বিভিন্ন প্রকার তৈলবীজ, পান, সুপারি ইত্যাদি উৎপন্ন হত। ধনপতি ও শ্রীমন্তের বাণিজ্যযাত্রার বিবরণে, বস্তুবদল অংশে তার বিবরণ আছে। বিভিন্ন প্রকার শাকসব্জি, নিম, শিম, বেগুন, মূলা, কলা, লাউ,কুমড়ো; বিভিন্ন প্রকার শাক, বিভিন্ন প্রকার ফলমূল— আম, কাঁঠাল, নারিকেল, বেল, লেবু, জামির, তাল ইত্যাদি উৎপন্ন হত। বাণিজ্যযাত্রা অংশে ও রন্ধন বর্ণনা অংশে তার বিবরণ পাওয়া যায়। পশুপালনও বাংলার কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির একটি অন্যতম দিক। সেকালে ধনীরাও পশুপালন করত। চণ্ডীমঙ্গলে খুল্লনার ছাগল চরানোর বৃত্তান্ত সেই কথাই প্রমাণ করে।মানিক দত্তের কাব্যে পাই কলিঙ্গরাজ্যে অকালে ঝড়বৃষ্টি প্রাকৃতিক দুর্যোগে গৃহপালিত পশুপাখিও ভেসে গিয়েছিল—"ছাগল ভেড়া মনিষ্য ঘোড়া গোরু পালেপাল।"(মানিক/১২৯)। নদীমাতৃক বাংলাদেশের নদীনালায় প্রচুর মাছ পাওযা যেত, নিম্নশ্রেণীর লোকেরা মাছ ধরে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করত।

বাংলাদেশের চাষ পদ্ধতি ছিল প্রাচীন ও সাধারণ এবং চাষের উপকরণও ছিল যৎসামান্য, আর চাষ পদ্ধতি ছিল গতানুগতিক। সাধারণত গরু বা মহিষ টানা লাঙলেই জমি চাষ হত. তাই কালকেতু তার রাজ্যে আগত প্রজাদের বলদ গরু, হাল উপহার দিয়েছিল। চাষবাস ছিল প্রধানত প্রকৃতি নির্ভর; অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি হলে ফসল নষ্ট হয়ে যেত. তখন প্রজার দুর্দশার সীমা থাকত না। বুলান মণ্ডলের উক্তিতে একথা জানা যায়—

"বুলান মণ্ডল বলে শুন মোর ভাই।
হাজিল ক্ষেতের শস্য তাহে না ডরাই॥" (ঐ/৬৬) [১৭১]

কৃষিই বাংলার অর্থনীতির মূল ভিত্তি হলেও কিন্তু কৃষকের অবস্থা ভাল ছিল না। কারণ কৃষকরা শাসকের শোষণের

শিকার হত। শাসক থেকে জমিদার, মহাজন সকলের ক্রুর দৃষ্টি পড়ে থাকত কৃষকের কষ্টোপার্জিত ফসলের উপর, কিন্তু তবুও সাধারণ মানুষ কৃষির উপরই নির্ভরশীল ছিল।

বাণিজ্য : মধ্যযুগের অর্থনীতি বাণিজ্য নির্ভর ছিল না।দেশের সাধারণ মানুষ ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে খুব আগ্রহী ছিল না বলেই মনে হয়। ধনপতি বা চাঁদ সদাগরের বহির্বাণিজ্য তৎকালীন ইতিহাসের অনুষঙ্গ বহন করে না, তবে দেশের অভ্যন্তরেই অন্তর্বাণিজ্য চলত তার প্রমাণ মঙ্গলকাব্যে পাওয়া যায়। কৃষি নির্ভর অর্থনীতিতে ব্যবসা-বাণিজ্যের দৌলতে বণিক শ্রেণীর হাতে প্রচুর কাঁচা পয়সা হয়েছিল, তারা অর্থনৈতিক কারণে সমাজের সর্বোচ্চ স্থান দখল করেছিল। কবির কল্পনা হলেও এই সমস্ত বিবরণের ঐতিহাসিক সত্যতা অস্বীকার করা যায় না। লহনার উক্তিতে ধনপতির পিতৃপিতামহের আমলে বহির্বাণিজ্যের কথা পাওয়া যায় কবিকঙ্কণের কাব্যে—

"শ্বশুর আছিল রঙ্ক আনিতে চন্দন শঙ্খ
সাজন করিয়া সাত নায়।
বেচি কেনি হৈল ধনি ইহা সব আমি জানি
কি বুঝাব অবলা তোমায়॥" (ঐ/১৫১)[১৭২]

নৌ-শক্তি ও রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বহির্বাণিজ্যে বাঙালী সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। চাঁদ সদাগরের মত ব্যক্তিগত উদ্যোগে বাণিজ্যযাত্রা ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে ছিল না, চণ্ডীমঙ্গলে স্থানীয় রাজার পৃষ্ঠ- পোষকতায় ধনপতি ও শ্রীমন্তের বাণিজ্যযাত্রার কথা পাই। এই বাণিজ্যের কারণে বাঙালী বণিকরা অর্থশালী হয়ে উঠেছিল। মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যে সপ্তগ্রামের বণিকদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কথা আছে—

"সপ্ত-গ্রামের বেণে সব কোথায় না যায়।
ঘরে বসে সুখ মোক্ষ নানা ধন পায়॥" (ঐ/১৫৬)[১৭৩]

সপ্তগ্রামের বণিকদের সম্পর্কে এই তথ্য ঐতিহাসিক সত্য। মুহম্মদ আবদুল জলিল "মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালী সমাজ" গ্রন্থে লিখেছেন- "সপ্তগ্রামের বণিকেরা ঘরে বসে যে প্রচুর ধন অর্জন করতো তার পরিচয় সমসাময়িক বিদেশী পর্যটকদের বর্ণনাতেও পাওয়া যায়।"[১৭৪] মধ্যযুগের বিভিন্ন কাব্যে বাঙালীর এই বাণিজ্যের পরিচয় আছে। এমন কি বিদেশী বণিকদের আগমন ঘটলেও বাঙালী বণিকদের বাণিজ্যের আগ্রহ হ্রাস পায়নি। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে সেকালের বাণিজ্যের আমদানি- রপ্তানি দ্রব্যের পরিচয় পাওয়া যায়। রপ্তানি দ্রব্যের বেশীর ভাগই বাংলার কৃষিজাত ও কুটীরশিল্পজাত দ্রব্য। এখানে যে সমস্ত রপ্তানি দ্রব্যের উল্লেখ পাই সেগুলি হল- — হরিণ, ভেড়া, পায়রা, কাঁচ, চিনি, লবণ, পাট, বিভিন্ন প্রকার ফল, মসলা ইত্যাদি। অপরদিকে বিভিন্ন আমদানি দ্রব্যগুলি হল, যেমন হাতি, ঘোড়া, বিভিন্ন প্রকার মূল্যবান পাথর, যথা- নীলা, মুক্তা, মাণিক্য, শঙ্খ ইত্যাদি। কবিকঙ্কণের কাব্যে ধনপতির বাণিজ্যযাত্রা উপলক্ষে দ্রব্য বিনিময় অংশে সেকালের আমদানি-রপ্তানি দ্রব্যের পরিচয় আছে—

"বলদ আসে নানা ধন নায়ে দিল ভরা।
অষ্ট দিক্ হৈতে দ্রব্য আনে করি ত্বরা॥
কুরঙ্গ বদলে তুরঙ্গ পাব
নারিকেল বদলে শঙ্খ।
বিড়ঙ্গ বদলে লবঙ্গ পাব
শুণ্ঠের বদলে টঙ্ক।
প্লবঙ্গ বদলে মাতঙ্গ পাব
পায়রা বদলে শুয়া

গাছু ফল বদলে জায়ফল পাব
বহড়ার বদলে গুয়া॥
পাটশণ বদলে ধবল চামর পাব
কাচের বদলে নীলা।
লবণ বদলে সৈন্ধব পাব
জোয়ানী বদলে জীরা।
কন্দ বদলে মাকন্দ পাব
হরিতাল বদলে হীরা।
চইয়ের বদলে চন্দন পাব
ধুতির বদলে গড়া।
শুক্তা বদলে মুকুতা পাব
ভেড়ার বদলে ঘোড়া।
মাষ মসুরী তণ্ডুল ধুসরি
বাটলা চক চিনা।
বলদ শকটে তৈল ঘৃত বটে
সদাগর আনিছে কিনা॥
গোধূম কিনে যব খুঁজিয়া সরবপ
মুগ তিল মাড়ুয়া ছোলা।
কিনিয়া সদাগর পূরিল বহুতর
লবণের পাতিয়া গোলা॥" (ঐ/১৫৫)[১৭৪]

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষাংশের কবি দ্বিজ রামদেবের কাব্যে এরূপ দ্রব্য বিনিময়ে আমদানি-রপ্তানি দ্রব্যের পরিচয় পাই—

"সিংহলের লাভালাভ না জিজ্ঞাস মোরে।
উজানি কাঞ্চনমএ যদি আইস ঘরে॥
লোহা সীসা লঅ সাধু যত বাস মন।
এহার বদলে পাইবা নির্ম্মল কাঞ্চন।
গুয়াফল লঅরে সাধু কি কহিমু আর।
এহার বদলে পাইবা গজমতি হার॥
ঘৃণা তেজি লঅ সাধু পাটের পাছরা।
এহার বদলে পাইবা মুকুতার ছড়া॥
পারাবত লঅরে সাধু যে আছে ধবল।
এহার বদলে পাইবা চামর গঙ্গাজল॥
বংশের কামান লও তথা অতি সুচারু।
এহার বদলে পাইবা চন্দন দেবদারু॥" (রামদেব/২৬৫)

দ্বিজ মাধব ও দ্বিজ রামদেবের কাব্যে রপ্তানি দ্রব্য হিসাবে সোনা, রূপা, সীসা, লোহা, তামা, পিতল, কাপড়, এমন কি গঙ্গাজলও রপ্তানি করার কথা পাই—

"সোনা রূপা লোহা সীসা রাঙ্গা কাপড়।
তামা পিত্তল তোলে চামর গঙ্গার জল॥
বহুবিধ বস্ত্র লৈল বস্থা বস্থা বান্ধি।
ধাতুদ্রব্য লইল সাধু নাহিক অবধি॥" (দ্বিজ মাধব/২২৭)

এসমস্ত তথ্য বাংলার শিল্প ও কৃষি সম্পদের সমৃদ্ধির পরিচয় বহন করে। কবির বর্ণনায় বাহুল্য থাকলেও তার বাস্তবতাকে অস্বীকার করা যায় না। এযুগের অর্থনীতিতে বহির্দেশীয় বাণিজ্য অপেক্ষা অন্তর্দেশীয় বাণিজ্য প্রাধান্য লাভ করেছিল। সে সময় দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য করার নানা প্রমাণ আছে। তবে যাই হোক, গ্রামীণ অর্থনীতির মূল ভিত্তি ছিল গ্রামীণ হাট বা বাজার। দেশের উৎপাদিত কৃষিজাত ও শিল্পজাত দ্রব্য, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ গ্রামীণ হাটেই বিক্রি হত। মানুষ হাট থেকেই তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করত। কালকেতু গুজরাট নগরে তাই হাট প্রতিষ্ঠা করতে ভোলেনি। বিদেশী বণিকগণ এমন কি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা নামধারী জমিদারগণ এই গ্রামীণ হাটকে কেন্দ্র করে ব্যবসা- বাণিজ্য করত। মানিক দত্ত কালকেতুর নগর পত্তন ও প্রজা স্থাপন সম্পর্কে লিখেছেন-

"আর জত বসিল লোক কি কহিব তরে।
নগর মধ্যে হাট পড়ে শনি মঙ্গল বারে॥
প্রথমে কৈবর্ত্ত বৈসে বাজারে বেচে ধান।
বারই ভাই বসিল তারা বেচে পান॥
বাণিয়া হাট বসি গেল অন্য২ পসার।
গোওাল হাট বসি গেল মধুর বাজার॥
তৈলঙ্গা হাট বসি গেল বাজারে বেচে ভুণি।
বীরের বাজারে বেচে ভোট কম্বল খানি॥
হস্তী ঘোড়া খরিদ হএ বীরের বাজারে।
চারি রাজ্যের রাজা আইসে বাণিজ্য করিবারে॥" (মানিক/১৩২-১৩৩)

মানিক দত্ত জানিয়েছেন হাটে 'ভোট কম্বল' বিক্রি হত। সম্ভবত ভুটান থেকে আমদানি করা কম্বলকে ভোট কম্বল বলা হত। দ্বিজ মাধব ও কবিকঙ্কণের কাব্যে হাট বা বাজারের চিত্র আছে। কবিকঙ্কণের কাব্যে গোলাহাটের কথা আছে, যেখানে কালকেতু নগর স্থাপনের উপযুক্ত দ্রব্যাদি ক্রয় করে। কবিকঙ্কণের বিবরণ অনুসারে গোলাহাটের নগর বাজারে সকল প্রকার জিনিসপত্র— এমনকি যুদ্ধাস্ত্র বিক্রির কথাও আছে। আবার বণিক খণ্ডে দুর্বলার বাজার করার দৃশ্য আছে। সুতরাং গ্রামীণ অর্থনীতিতে এ সকল হাটের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না।চাকুরীকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করার ঝোঁক এযুগে মানুষের মধ্যে দেখা যায়নি। তবে কিছু কিছু মানুষ রাজসেবায় অর্থাৎ রাজকার্যে ও সেনাবাহিনীতে যোগদান করত।

শিল্প ঃ কৃষির পরেই বাংলার অর্থনীতিতে এযুগের অন্যতম ভিত্তি ছিল শিল্প। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মতই চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেও বাংলার ক্ষুদ্রশিল্পের পরিচয় আছে। বৃহৎশিল্প তৎকালীন বাংলাদেশে ছিল না। ক্ষুদ্রশিল্পের মধ্যে অন্যতম হল তাঁত বা বস্ত্রবয়ন শিল্প। বাংলার ঘরে ঘরে হস্তচালিত তাঁত ছিল, তাই মেয়েরাও সুতা কাটত। ষোড়শ শতাব্দীর কবি মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যে এর উল্লেখ আছে। নারীগণের পতিনিন্দা অংশে এক নারী বলেছে-

"প্রভুর দোসর নাহি উপায় কে করে।
কাটনার কড়ি কত জোগাব ওঝারে॥
দাদনি না দেয় এবে মহাজন সবে।
টুটিল সুতার কড়ি উপায় কি হবে॥" (মুকুন্দ/২০)

ষোড়শ শতাব্দীতে রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়, বাংলার তাঁত শিল্পীরা অধিক লাভের প্রত্যাশায় গ্রাম ছেড়ে শহরমুখী হতে থাকে। কালকেতু প্রতিষ্ঠিত গুজরাট নগরে তাঁতিদের আগমন ঘটে, দ্বিজ মাধবের কাব্যেও তাঁতিদের আগমনের কথা পাওয়া যায়। মুকুন্দের কাব্যে পাই—

"শত শত একজায় গুজরাটে তন্তুবায়
ভুনি ধুতি বোনে জোড় গড়া।" (ঐ/৭১)[১৭৫]

মধ্যযুগের সাহিত্যে বাংলার উৎকৃষ্ট বস্ত্র— বুটিদার, তসর, মেঘডম্বর ইত্যাদি শাড়ির উল্লেখ আছে। তাছাড়া গামছা, চাদর, দুলিচা, চাঁদেয়া, মশারি, বিছানা, ইজার ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের ব্যবহার্য বস্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। মধ্যযুগে বাংলাদেশে লবণ, চিনি ইত্যাদি উৎপাদিত হত। মোদকের কারখানায় চিনি ও বিভিন্ন প্রকার খাদ্যদ্রব্য উৎপাদিত হত। কালকেতুর গুজরাট নগর পত্তনে যে সমস্ত বৃত্তিধারী জাতির আগমন হয়েছিল তাদের বেশীরভাগ কুটীরশিল্প বা হস্তশিল্প উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত ছিল, যেমন— শঙ্খশিল্প, লৌহশিল্প, মৃৎশিল্প, কাঁসা-পিতলের শিল্প, স্বর্ণশিল্প বা অলঙ্কার শিল্প, চর্মশিল্প; তাছাড়াও চুন, তেল, বিভিন্ন প্রকার গন্ধদ্রব্য ইত্যাদি উৎপাদিত হত। চর্মকাররা জুতা, খড়ম তৈরী করত। কবিকঙ্কণ লিখেছেন—

"মোজা পানই আব জিন নিরময়ে অনুদিন
চামার বসিল এক ভিতে।" (ঐ/৭২)[১৭৬]

বাংলার মৃৎশিল্প, চিত্রশিল্প, অলঙ্কার শিল্প, শঙ্খশিল্প বিখ্যাত ছিল। বিদেশেও এসকল শিল্পদ্রব্যের জনপ্রিয়তা ছিল। ধনপতির বাণিজ্যযাত্রা অংশে তার পরিচয় আছে।

বাংলাদেশ বনজ সম্পদে চিরদিনই সমৃদ্ধ ছিল, বনে বিভিন্ন ধরনের উৎকৃষ্ট কাঠ, বাঁশ, বেত ও বিভিন্ন ধরনের পাতা উৎপাদিত হত। 'কালকেতুর বনকর্তন' অংশে বন কাটার সময় বাংলার কাষ্ঠ সম্পদের পরিচয় পাওয়া যায়। এই বনজ সম্পদকে অবলম্বন করে বিভিন্ন ধরনের কাঠের আসবাব তৈরী করত সূত্রধরগণ। তারা খাট, পালঙ্ক, পিঁড়ি, চৌদল, কুর্সী ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় আসবাব তৈরী করত। তাছাড়া নৌকা, সাঁকো ইত্যাদি তৈরীর প্রসঙ্গও পাওয়া যায় বিভিন্ন গ্রন্থে। মাল পরিবহনের উপযোগী নৌশিল্প যথেষ্ট উন্নত ছিল। সূত্রধরগণ বিভিন্ন ধরনের উন্নত মানের পরিবহন যোগ্য নৌবহর তৈরী করত। তাদের গঠন ও আকৃতি বিভিন্ন রকম, তাদের নামও ছিল বিভিন্ন। বাংলার কাষ্ঠ শিল্পীগণ কাঠ থেকে সুন্দর খেলনা তৈরী করত। দ্বিজ রামদেবের কাব্যে বাঁশের কামানের কথা পাই— "বংশের কামান লও তথা অতি সুচারু।" (দ্বিজ রামদেব/২৬৫)। তাছাড়া নিম্নশ্রেণীর ডোম, পাটনী প্রভৃতি অন্ত্যজরা বাঁশ ও বেত দিয়ে ডালা, কুলা, ঝুড়ি, ঝাঁপি, মাথাল বা টোকা তৈরী করে বিক্রি করত। মধ্যযুগে কাগজ শিল্প না থাকলেও দেশীয় পদ্ধতিতে কাগজ তৈরী হত, কেননা এযুগে দেশীয় কারিগরদের তৈরী তুলট কাগজের প্রচলন ছিল। বাঁশ, কাঠ, কার্পাস, গাছের বাকল থেকে কাগজ তৈরী করে এক শ্রেণীর মানুষ 'কাগজী' নামে পরিচিত হয়েছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলাদেশে বৃহৎশিল্প হিসাবে লোহা ও সীসা শিল্পের উল্লেখ পাওয়া যায়। শিল্পক্ষেত্রে বাংলার সমৃদ্ধির কথা মঙ্গলকাব্যে সুবিদিত।

জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা ঃ কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির ফলে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল এযুগে, কিন্তু এই উন্নত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ফলভোগ করত দেশের প্রধানত বণিক সম্প্রদায়, জমিদার, মহাজন, রাজকর্মচারী, সামন্তরাজ ইত্যাদি কতিপয় উচ্চবিত্তের মানুষ। আপামর সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব ভাল ছিল না। ধনীরা বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, জন্মদিন, অন্নপ্রাশন বা বিভিন্ন পূজা-পার্বণে প্রচুর ব্যয় করত, দানধ্যান করত। কবিকঙ্কণের কাব্যে ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধের বণিক সম্প্রদায়ের সমৃদ্ধির পরিচয় আছে। ধনপতির বাণিজ্যযাত্রার প্রাক্কালে খুল্লনা ধনপতিকে জানায়, ঘরে প্রচুর ধনসম্পদ আছে

তাই বাণিজ্যযাত্রা নিষ্প্রয়োজন—

"ঘরের চন্দন শঙ্খ দিয়া হও নিরাতঙ্ক
রাজ স্থানে পাইবে প্রসাদ॥
ভাণ্ডারে আছয়ে নীলা রসান নিকর শিলা
মাণিক বিদ্রুম মরকত॥
যত আছে নিজগারে দেহ লয়ে নরবরে
সুখে থাক জায়া-অনুগত॥" (মুকুন্দ/১৫১)[১৭৭]

ধনপতির পিতৃশ্রাদ্ধে বিভিন্ন স্থান থেকে যে সমস্ত বণিকদের আগমন ঘটে তাদের ধন-ঐশ্বর্যের বর্ণনা পাওয়া যায়-

"বর্দ্ধমান হৈতে বেণে আইসে ধূসদত্ত।
সর্ব্বজনে গায় যার কূলের মহত্ত্ব।
.. ..
একে একে বণিকের কত কব নাম।
সাত শত বেণে আইসে ধনপতি-ধাম॥" (ঐ/১৩৯-১৪০)[১৭৮]

ধনীরা আহার-বিহারে, পোশাক-পরিচ্ছদে, গহনা-অলঙ্কারে প্রচুর ব্যয় করত। দ্রব্যমূল্য কম থাকায় সাধারণ মানুষের খাওয়া পরার অভাব হত না, কিন্তু দরিদ্রের হাতে কাঁচা পয়সা না থাকার ফলে ক্রয় মূল্য দিয়ে কেনার ক্ষমতা মানুষের কম ছিল। তৎকালীন দ্রব্যমূল্য থেকেও মানুষের সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। দ্রব্যমূল্য কত কম ছিল তার প্রমাণ আছে কালকেতুর বিবাহের কেনাকাটায়। দ্বিজ মাধবের কাব্যে দেখি কালকেতুর বিবাহে মাত্র তেরো গণ্ডা কড়িতেই বিবাহের কেনাকাটা সম্পূর্ণ হয়েছে। কবির বর্ণনা অনুসারে—

"গণ্ডা তের কড়ি লইয়া বীর গেল হাটে॥
পাঁচ গণ্ডার কিনিলেক দুইগাছি ধড়া।
একখানি খইয়া লইল দিয়া পাঁচ কড়া॥
দশ কড়ার খড় কিনি হরিষ প্রচুর ।
পাঁচ কড়ার কিনিলেক মাটিয়া সিন্দুর॥
চা'র কড়ার পান কিনে এক কড়ার চুন।
তিন কড়ার মরিচ কিনে দুই কড়ার নুন॥" (দ্বিজ মাধব/৩৮)

কবিকঙ্কণের কাব্যে দুর্বলার বাজার করার মধ্যে দিয়ে সেকালের দ্রব্যমূল্যের পরিচয় পাওয়া যেতে পারে।

দরিদ্ররা যৎসামান্য আয়ে সংসার নির্বাহ করত, হরগৌরীর সংসারযাত্রা ও ফুল্লরার বারমাস্যা অংশে তার সুন্দর বিবরণ আছে। গ্রামীণ জনসাধারণ অভাবে প্রতিনিয়ত মহাজনের শরণাপন্ন হত, আর মহাজন অশিক্ষিত সাধারণ মানুষকে ঠকিয়ে চাল, ক্ষুদ ইত্যাদির বিনিময়ে কিংবা সামান্য অর্থের বিনিময়ে তাদের সর্বস্বান্ত করত। কাজেই দারিদ্র্য সাধারণ মানুষের নিত্য সহচর ছিল। তাই অভাব যেমন কিরাত কালকেতুর ঘরে, তেমনি ব্রাহ্মণ শিবঠাকুরের ঘরেও। কবিকঙ্কণের কাব্যে ভিখারী শিবের খেদোক্তি—

"দেশে দেশে ফিরি কত ভিক্ষা করি
ক্ষুধায় অন্ন না মিলে।" (মুকুন্দ/২৩) [১৭৯]

'কালকেতুর অন্নচিন্তা' অংশে উল্লিখিত কিরাত পাড়ায় বসবাসের কারণে ধার বা ঋণ মেলে না—

"কিরাত পাড়ায় বসি না মিলে উধার।
হেন বন্ধু জন নাহি সহে কেহ ভার॥" (ঐ/৪৭)[১৮০]

শিবের উক্তি আর কালকেতুর উক্তিতে সাজুয্য আছে। ডঃ সুমঙ্গল রাণা 'মুকুন্দের সমাজ চেতনা এবং কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে তৎকালীন সমাজ' প্রবন্ধে লিখেছেন— "ফুল্লরার মুখে— 'কিরাত নগরের বসি না মিলে উধার।' আক্ষেপোক্তি নিতান্তই অর্থহীন।" [৩১] –এই মন্তব্যকেও তেমনভাবে গ্রহণ করা যায় না। কারণ দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল বলেই কিরাত সমাজ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধ হবে এমন কথা ভাবা যায় না। ফুল্লরার বারমাস্যাতে ফুল্লরার উল্লিখিত দারিদ্র্যের চিত্র বর্ণনা শুধু মাত্র সপত্নী সমস্যাকে কেন্দ্র করেই তা নয়, কারণ পূর্বে কালকেতুর মুখে তার অন্ন চিন্তার কথা শোনা যায়। কিরাতের স্ত্রী ফুল্লরার মাংস বেচে সংসার চলে, কিন্তু বৈশাখ মাসে লোকে মাছ-মাংস খায় না, তাই মাংস বিক্রি না হওয়ায় তার ঘরে অন্নাভাব দেখা দেয়, সুতরাং ফুল্লরার মত দরিদ্রেরা বৈশাখের রোদে পোড়ে, আষাঢ়ের জলে ভিজে, তাদের শীতের বস্ত্র জোটে না। ফুল্লরার 'জানু ভানু কৃশাণ' মাত্র সম্বল। এই বর্ণনা নিছক সপত্নী বিতাড়নের মন্ত্র নয়, এর ঐতিহাসিক সত্যতা অস্বীকার করা যায় না। পরবর্তীকালের জীবন মৈত্রের 'পদ্মাপুরাণ', তন্ত্রবিভূতির মনসামঙ্গল , রামেশ্বরের শিবায়নে এই চিত্র পাওয়া যায়। মুকুন্দের পূর্ববর্তী কবি দ্বিজ মাধবের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ফুল্লরার বারমাস্যায় আছে অনুরূপ বর্ণনা—

"শ্রাবণ মাসেতে ঘন বরিখে ঝিমানি।
মাথা থুইতে ঠাই নাই ঘরে আঠু পানি॥
শীতের কারণে ঘরে বেড়াই চারি কোণে।
মানের পাত মুণ্ডে দিয়া বঞ্চি দুই জনে॥
ভাদ্র মাসেত রামা বিদ্যুৎ ঝঙ্কার।
হেনকালে চলি আমি মাথায়ে পসার॥" (দ্বিজ মাধব/৫৪)

দ্বিজ রামদেবেরর কাব্যেও অনুরূপ বর্ণনা পাই। বিদেশীদের বিররণে এযুগের সমৃদ্ধির চিত্র বর্ণিত হলেও নিরন্ন ঘরের চিত্র তাঁদের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল। দ্বিজ মাধব কালকেতুর প্রজাদের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের চিত্র অঙ্কন করেছেন। বাস্তবে এ চিত্র কালকেতুর আদর্শায়িত রাম রাজ্যের চিত্র। তবে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে তৎকালীন বাংলাদেশের সমৃদ্ধ অর্থনীতির চিত্র আছে তা অস্বীকার করা যায় না।

ধর্মজীবন ঃ একটি মাত্র মঙ্গলকাব্য শাখাকে আশ্রয় করে বাঙালী সমাজের ধর্মজীবনের স্বরূপ নির্ধারণ করা প্রায় অসম্ভব।বস্তুত বাঙালী সমাজ বহুধা বিভক্ত ছিল, ফলে তার আচার-আচরণ, বিশ্বাস-সংস্কার পৃথক ছিল। বর্ণাশ্রম প্রথা কবলিত বাঙালী সমাজে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ছাড়াও হিন্দু সমাজেই এত রূপভেদ ছিল যে তার স্বরূপ অন্বেষণ অত্যন্ত জটিল বিষয়। শৈব, শাক্ত, গাণপত্য, তান্ত্রিক, সহজিয়া, বৈষ্ণব সমাজের ধর্ম, কর্ম. চরিত্রের অনৈক্য প্রবল ছিল। আর্থসামাজিক কারণেও তাদের ব্যবধান অত্যন্ত বেশী ছিল, চণ্ডীমঙ্গলে তার ছায়াপাত ঘটেছে।

বাংলাদেশে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠা হলে হিন্দুর ধর্মীয় জীবনে যে অবক্ষয়ের সৃষ্টি হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় মধ্যযুগে বিভিন্ন সাহিত্য শাখায়। বিভিন্ন লৌকিক দেবদেবীই সমাজে অধিক ছিল, বৈষ্ণবধর্ম তখনো সমাজে প্রতিষ্ঠা পায়নি। উচ্চবর্ণের মানুষ এযুগে লৌকিক দেবদেবীকে স্বীকার করে নিয়েছিল, মঙ্গলকাব্যগুলি তার পরিচয় বহন করে। তাইতো ব্যাধ কালকেতুর উপাস্য দেবী চণ্ডী বা মঙ্গলচণ্ডী বরাভয়দাত্রী দেবী দুর্গায় পরিণত হয়েছে। বস্তুত কালকেতুর দেবী চণ্ডী আর খুল্লনার ব্রতের দেবী পৃথক হলেও তারা ধীরে ধীরে এক ও অভিন্ন হয়ে ওঠে। এরূপে বহু দেবদেবীর রূপান্তর ঘটেছে তার পরিচয় আছে মধ্যযুগের সাহিত্যে। কবিরা কাব্য রচনা করতে গিয়ে গণেশাদি পঞ্চদেবতার বন্দনা করেছেন এবং তাছাড়াও বহু দেবদেবীর বন্দনা পাই, যেখানে পৌরাণিক বা লৌকিক কেউই অপাঙ্‌তেয় নয়। গণেশ. সূর্য, সরস্বতী, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, রামচন্দ্র, মনসা, চণ্ডী এবং সর্বদেবদেবীর বন্দনা বিভিন্ন কাব্যে আছে। কবিকঙ্কণ চৈতন্য বন্দনা করেছেন, কারণ চৈতন্যদেব তখন দেবতা রূপে সমাজে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। আবার কবি যে দেবীর বিজয়গাথা রচনা করেছেন কবি যে স্বয়ং ঐ দেবীরই ভক্ত ছিলেন তা নয়। স্বয়ং

কবিকঙ্কণ মুকুন্দের ধর্মমত কি ছিল এ নিয়ে মতভেদ থাকলেও সম্ভবত তিনি বৈষ্ণব ছিলেন বলে মনে হয়। কবিকঙ্কণের কাব্যে বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব আছে, ধনপতি বাণিজ্য যাত্রাকালে নদী পথে যে সমস্ত তীর্থস্থান পড়ে সেগুলিতে পূজা ও তর্পণ করে। নবদ্বীপ সে সময় তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। বেদ পুরাণ, শাস্ত্রগ্রন্থাদির কত প্রভাব বাঙালীর ধর্মীয় জীবনে ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের যত্রতত্র। সামাজিক আদর্শ ও ন্যায়নীতিবোধে বাঙালী চিরকাল উদ্দীপ্ত হয়েছে। সমাজের নিম্নকোটিতে অবস্থিত ব্যাধপত্নী ফুল্লরাকেও তাই শাস্ত্রের নীতি, আদর্শ ও উপদেশ উচ্চারণ করতে শুনি, হিন্দুর ধর্মীয় জীবনে যা ছিল সিদ্ধ রসের মত। দ্বিজ রামদেবের কাব্যের যত্রতত্র বৈষ্ণবীয় অনুষঙ্গকে ধুয়া হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

কবিকঙ্কণের কাব্যে হরিনাম মাহাত্ম্য কীর্তন করা হয়েছে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে হিন্দুধর্মের মধ্যে ভেদাভেদ খুব একটা দেখা যায় না, আসলে ধর্মকলহ চৈতন্যদেবের প্রেম সাধনার স্রোতে ভেসে গিয়েছিল। তবুও এক শ্রেণীর মানুষ কঠোরভাবে স্বীয় ধর্মাচরণ করত। উপাস্য দেবতার পূজা না করে জলগ্রহণ করত না। শৈব-শাক্তের যে উৎকট দ্বন্দ্ব চৈতন্য-পূর্ববর্তীকালের মনসামঙ্গলে আছে চণ্ডীমঙ্গলে ততটা নেই। মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যে দক্ষরাজ ও শিবের যে দ্বন্দ্বের কথা আছে তা ব্রাহ্মণশাসিত বৈদিক ধর্ম ও লৌকিক শৈবধর্মের দ্বন্দ্বের রূপচিত্র। মঙ্গলকাব্যগুলিতে যুগ লক্ষণের কথা ধরলে বলতে হয়, এখানে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বন্দ্বে বিশ্বাসের জয় হয়েছে। তবে চণ্ডীমঙ্গলে এই ধর্মদ্বন্দ্ব অপেক্ষাকৃত কম। মুকুন্দ চক্রবর্তী ও দ্বিজ মাধবের কাব্যে ধর্মকলহ জনিত সংশয় দৃষ্টি স্তিমিত, যুগপরিবর্তনের ফলে এই সংশয় দৃষ্টি আরো অবলুপ্ত হয়েছে। দ্বিজ রামদেবের কাব্যে এই সংশয় সামান্যতমও দেখা দেয়নি। আবার ধনপতির শাক্ত দেবী বিদ্বেষ উৎকট না হলেও বিদ্বেষের বীজ আছে, তাইতো ধনপতি সিংহল যাত্রাকালে চণ্ডীর ঘট পদদলিত করে যায়—

"ভূমিতে দেবীর ঝারি গড়াগড়ি যায়।
নিকট হইয়া সাধু ঠেলে বাম পায়॥" (মুকুন্দ/১৫৩)[১৮১]

ধনপতি শেষ পর্যন্ত শিবঠাকুরকে আঁকড়ে ধরে ছিল, আর শ্রীমন্ত যেমন মাতৃভক্ত তেমনি মাতৃ আজ্ঞা শিরে ধরেই স্ত্রীদেবতা চণ্ডীর আরাধনা করেছে। বস্তুত শ্রীমন্তের মধ্যে দিয়েই শাক্ত দেবীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ধনপতিও শেষ পর্যন্ত শাক্ত দেবীর মাহাত্ম্য স্বীকার করে নেয়, দ্বিজ মাধবের কাব্যে ধনপতি তাই বলে—

"ধনপতি বোলে মোর ব্যাধি যদি খণ্ডে।
শিবের ঘরিণী মুই পূজিমু এই দণ্ডে॥" (দ্বিজ মাধব/২৯৩)

সমাজের বহু দেবদেবীর পূজা প্রচলিত ছিল ও নানা বার-ব্রত প্রচলিত ছিল। তাই মানিক দত্তের কাব্যে বিশ্বকর্মা দেবীর কাঁচুলি চিত্রনে লৌকিক অন্যান্য দেবী, মনসা ও ষষ্ঠীকে চিত্রিত করতে ভোলেনি। বাঙালীর ঘরে ঘরে সারা বছর ধরে নানা বারব্রত পালিত হত। কবি লিখেছেন—

"বৈশাখ মাসেত নরে নানা ব্রত করে।
কেহো করে দান পুন্য ভব তরিবারে॥" (মানিক/৯৯)

বস্তুত বৈশাখ মাস ধর্ম মাস হিসাবে চিহ্নিত, তাই এসময় লোকে নানা ব্রত পালন করত। লৌকিক দেবদেবীর মত তান্ত্রিকধর্ম প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্মও তন্ত্রচর্চার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।চৈতন্যভাগবত ও অন্যান্য গ্রন্থে তন্ত্রচর্চার কথা আছে, তাদের বিচিত্র আচরণের কথা আছে। মদ্য, মাংস, বলি সহযোগে তন্ত্রের দেবীর পূজা হত। মারণ, উচাটন, বশীকরণে মানুষ তান্ত্রিকের আশ্রয় নিত। সপত্নী বিতাড়নের জন্য লহনা তন্ত্রচর্চা ও তান্ত্রিকের আশ্রয় নেয়। লৌকিক দেবদেবীর পূজায় মদ্য, মাংস, ব্যবহৃত হত; বলিদান প্রথাও প্রচলিত ছিল—

"শনিবারের পূজা শুনহ সন্ধান।

ছাগ মহিষ মেষ দিঞা বলিদান॥" (মানিক/৩৭৫)

যাই হোক, এযুগে ধর্মীয় বাতাবরণে সকল ধর্মের সমন্বিত রূপই প্রস্ফুটিত হয়েছে। তাই কালকেতুর গুজরাট নগরে সকল জাতির বসবাস; শুধু তাই নয়, কবির চিন্তায়, মানুষের মননে ধর্ম সমন্বয়ের ভাবনা এসেছে। কবি তাই বলেন—

"শিবপূজা করে যেবা দেবীপরায়ণে।
আপনি রাখেন তারে লক্ষ্মীনারায়ণে॥" (মুকুন্দ/২৩৯)[১৮২]

সমাজের মধ্যে পাপ, অনাচার লুক্কায়িত থাকায় মুকুন্দ চক্রবর্তী 'কলির মাহাত্ম্য' বর্ণনা করতে গিয়ে অনাগত সম্ভাবনার ইঙ্গিত করেছেন, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে তার ফলশ্রুতি লক্ষ করা যায়।

চণ্ডীমঙ্গলে বাঙালীর চরিত্রগত রূপটিও প্রকাশিত হয়েছে। বস্তুতপক্ষে, লোকসমাজে মানব চরিত্র গঠনে দেবদেবীর প্রভাব তো ছিলই এবং দেবদেবী চরিত্রের বিবর্তনে মানব বিবর্তনের চিত্রই পাওয়া যায়।দেবী চণ্ডী মনসার মত ক্রূর নয়, সে অনেক বেশী কোমল। চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে দেবীর স্বরূপ পরিবর্তিত হয়েছে, তাই চণ্ড বিনাশিনী চণ্ডী, দ্বিজ মাধবের মঙ্গলাসুর নিধনকারিনী চণ্ডী মুকুন্দের কাব্যে মাতৃমূর্তি পেয়েছে। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই দেবী আরও পরিবর্তিত হয়েছে।ধর্মের প্রভাবে সমাজে মানব চরিত্রের কমনীয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে, তাই ধনপতি চরিত্রে চাঁদের মত উৎকট দেব বিরোধিতা নেই। মানুষের স্বাতন্ত্র্যবোধ প্রতিষ্ঠিত না হলেও তার খানিকটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় চণ্ডীমঙ্গলে। খুল্লনা সনকার মত মাতা হলেও স্ত্রী হিসাবে সনকা অপেক্ষা অনেক বেশী সক্রিয়। শ্রীমন্ত লখীন্দরের মত ব্যক্তিত্বহীন নয়, সে মায়ের সম্মান ও নিজের আত্মপরিচয় উদ্ধারে সিংহলযাত্রা করে। তবে সমাজে ভাঁড়ু দত্ত ও মুরারী শীলের মত ঠক-প্রবঞ্চক, মুরারী পত্নীর মত দুর্নীতিপরায়ণ, দুর্বলার মত প্ররোচনাকারী দাসী, লীলাবতীর মত সাধারণ মানুষরা বসবাস করত, যারা মিথ্যাচারীতা, ছলচাতুরী ও অভিনয় দ্বারা মানুষের সর্বনাশ করতে উদ্যত হত। সামাজিক ন্যায়নীতি আদর্শবোধ তাদের পীড়িত করত না।

তথ্যপঞ্জী

১। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ডঃ সুকুমার সেন, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৪১২।

২। ঐ, পৃঃ ৪১৫।

৩। কবিকঙ্কণ-চণ্ডী, মুকুন্দ চক্রবর্তী, শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বপতি চৌধুরী সম্পাদিত, পৃঃ ।

৪। মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত (ভূমিকা অংশ)।

৫। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৪৭৫।

৬। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ডঃ সুকুমার সেন, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৪৪৯।

৭। মঙ্গলচণ্ডীর গীত, দ্বিজ মাধব, সুধীভূষণ আচার্য সম্পাদিত। (ভূমিকা অংশ, কবি-প্রসঙ্গ)।

৮। সমগ্র বাংলা সাহিত্যের পরিচয়, শ্রী পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃঃ ৩১০।

৯। মঙ্গলচণ্ডীর গীত, দ্বিজ মাধব, সুধীভূষণ আচার্য সম্পাদিত, (ভূমিকা অংশ, কবি-প্রসঙ্গ)

১০। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ডঃ সুকুমার সেন, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৪৫৯-৪৬০।

১১। সমগ্র বাংলা সাহিত্যের পরিচয়, শ্রী পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃঃ ৩১১।

১২। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৫৪১।

১৩। অভয়ামঙ্গল, দ্বিজ রামদেব, আশুতোষ দাস সম্পাদিত, (ভূমিকা অংশ, কবি পরিচয়)।

১৪। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৫৪১।

১৫। ঐ, পৃঃ ৫৪৩।

১৬। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ডঃ সুকুমার সেন, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৪২৩।

১৭। ঐ।

১৮। 'কবিকঙ্কণ মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল আলোচনা ও পর্যালোচনা' গ্রন্থে 'মুকুন্দের সমাজ চেতনা এবং কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে তৎকালীন সমাজ' প্রবন্ধ, সুমঙ্গল রাণা— আশিস্‌কুমার দত্ত ও বিশ্বনাথ রায় সম্পাদিত, পৃঃ ১৩৬।

১৯। কবিকঙ্কণ চণ্ডী, ডঃ ক্ষুদিরাম দাস সম্পাদিত, পৃঃ ১৭৪।

২০। 'কবিকঙ্কণ মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল আলোচনা ও পর্যালোচনা' গ্রন্থে 'মুকুন্দের সমাজ চেতনা এবং কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে তৎকালীন সমাজ' প্রবন্ধ, সুমঙ্গল রাণা— আশিস্‌কুমার দত্ত ও বিশ্বনাথ রায় সম্পাদিত, পৃঃ ১৩৬।

২১। বাঙালীর চিন্তা চেতনার বিবর্তন, আহম্মদ শরীফ, পৃঃ ৯২।

২২। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালী সমাজ, মুহম্মদ আবদুল জলিল, পৃঃ ১০।

২৩। ঐ, পৃঃ ১০।

২৪। 'কবিকঙ্কণ মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল আলোচনা ও পর্যালোচনা' গ্রন্থে 'মুকুন্দের সমাজ চেতনা এবং কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে তৎকালীন সমাজ' প্রবন্ধ, সুমঙ্গল রাণা— আশিস্‌কুমার দত্ত ও বিশ্বনাথ রায় সম্পাদিত, পৃঃ ১৩৩।

২৫। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালী সমাজ, মুহম্মদ আবদুল জলিল, পৃঃ ১১।

২৬। ঐ, পৃঃ ১০।

২৭। বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, এম. এ. রহিম, ২য় খণ্ড, মোহাম্মদ অসাদুজ্জামান ও ফজলে রাব্বি কর্তৃক ইংরেজী থেকে বাংলায় অনূদিত, পৃঃ ১০৫ ।

২৮। কবিকঙ্কণ চণ্ডী, ক্ষুদিরাম দাস সম্পাদিত, (ভূমিকা অংশ) পৃঃ ৩০-৩১।

২৯। ঐ, পৃঃ ৩১।

৩০। ঐ, পৃঃ ৩১।

৩১। ঐ, পৃঃ ৩২।

৩২। ঐ, পৃঃ ৩২।

৩৩। 'কবিকঙ্কণ মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল আলোচনা ও পর্যালোচনা' গ্রন্থে 'মুকুন্দের সমাজ চেতনা এবং কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে তৎকালীন সমাজ' প্রবন্ধ, সুমঙ্গল রাণা— আশিস্‌কুমার দত্ত ও বিশ্বনাথ রায় সম্পাদিত, পৃঃ ১৩৩।

৩৪। 'কবিকঙ্কণ মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল আলোচনা ও পর্যালোচনা' গ্রন্থে 'চণ্ডীমঙ্গলের সমাজ তাত্ত্বিক সংকেত' প্রবন্ধ, ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার— আশিস্‌কুমার দত্ত ও বিশ্বনাথ রায় সম্পাদিত, পৃঃ ১৩১।

৩৫। মুকুন্দ চক্রবর্তীর কবিকঙ্কণ চণ্ডী, সনৎকুমার নস্কর সম্পাদিত, ভূমিকা অংশ, পৃঃ ৩৫।

৩৬। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালী সমাজ, মুহম্মদ আবদুল জলিল, পৃঃ ১৬০।

৩৭। ঐ।

৩৮। ঐ, পৃঃ ১৭১।

৩৯। 'কবিকঙ্কণ মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল আলোচনা ও পর্যালোচনা' গ্রন্থে 'মুকুন্দের সমাজ চেতনা এবং কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে তৎকালীন সমাজ' প্রবন্ধ, সুমঙ্গল রাণা— আশিস্‌কুমার দত্ত ও বিশ্বনাথ রায় সম্পাদিত, পৃঃ ১৩৫।

এই অধ্যায়ে মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের উদ্ধৃতিগুলি বসুমতী সংস্করণ থেকে গৃহীত হয়েছে, এখানে-

'কবিকঙ্কণ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল' গ্রন্থের ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত পুঁথির পাঠ নিম্নে সংযোজিত হল ঃ-

১) "সহর সেলিমা বাজ তাহাতে সজ্বন রাজ

- - - - - - - - - - - -

মিরাস পুরুষ ছয় সাত।" (পৃঃ ৩)

২) "শকে রস রস বেদ শশাঙ্কগণিতা
কত দিনে দিলা গীত হরের বনিতা।" (পৃঃ ৩১১)

৩) "আজি গণেশের মা রান্ধিবেন মোর মত
এবেলা আমরা মত রান্ধ বেঞ্জন দশ।" (পৃঃ ২৬)

৪) "পতির আদেশ ধরি রান্ধেন খুল্লনা নারী

- - - - - - - - - - - -

অনুচরী জোগায় দুবলা।" (পৃঃ ১৬০)

৫) "শিব স্নাঙরিআ কৈল দুই আঁচমন

- - - - - - - - - - - -

রসাল পনস-কোষ রসালের রস।" (পৃঃ ১৬১)

৬) "ভোজন সঙ্কলি আঁচমন কুতূহলে

কর্পূর তাম্বুল যায় হাসে খলখলে।" (পৃঃ ১৬১)

৭) "সাধু বলে দুয়ারে ভুঞ্জাও বন্ধুজন
অবশেষে গৃহস্থের উচিত ভোজন।" (পৃঃ ১৬১)

৮) "আজ্ঞা নিদয়ার ঘরে ফুল্লরা রন্ধন করে
আগে ধর্মকেতুর ভোজন।" (পৃঃ ৪৪)

৯) "চারি হাঁড়ি মহাবীর খায় খুদ-জাউ
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
তাহা দিআ খাও বীর ভাত তিন কাঁড়ি।" (পৃঃ ৪৬)

১০) "আপনার মত পাই তবে গ্রাস কত খাই
- - - - - - - - - - - -
আর দেহ ডুম্বুরের ফল।" (পৃঃ ৪০)

১১) "সম্ভ্রমে বসিতে দিল হরিণের ছড়া
- - - - - - - - - - - -
বেঞ্জনের তরে দিল নৌতুন খাপরা॥" (পৃঃ ৪৫)

১২) "বেসাত্য দুবলা জানে অবশেষে হাঁড়ি কিনে
মাগ্যা লয় তার কিছু ভাট।" (পৃঃ ১৫৮)

১৩) "সেই বর - জুগ্য কন্যা তোমার ফুল্লরা
খুঁজিয়া পাইল জেন হাঁড়ির মুঞের সরা।" (পৃঃ ৪২)

১৪) "রঙ্ক দুঃখী নাহি চিনি হেম ঘটে পিয়ে পানি
নাট গীত সভাকার ঘরে।" (পৃঃ ৮৬)

১৫) "পূর্বে পিত ভাণ্ডে বারি এবে তার হেম ঝারি
বাটী ঘটী সব হেমময়।" (পৃঃ ৮৬)

১৬) "সাজী আঁকুড়ি হাথে প্রবেশে কাননপথে
স্মঙরণ করিয়া শঙ্কর।" (পৃঃ ৩৪)

১৭) "চুপড়ি ভরিয়া নিল কদলির মোচা।" (পৃঃ ৮৫)

১৮) "নিরামিষ্য অন্ন দুঁহে করিল ভোজন
উলটি ডাবরে সাধু কৈল আঁচমন।" (পৃঃ ১৭৪)

১৯) "মনে বড় কুতূহলি কান্দেতে কড়ির থলি
হরপি তরাজু করি হাথে।" (পৃঃ ৬৬)

২০) "রজত দর্পণ ক্ষেম স্বস্তিক সিন্দুর হেম
- - - - - - - - - - - -
পূর্ণপাত্র প্রিদিপ সহিত।" (পৃঃ ১২৬)

২১) "হরিআ নাপিতে বীর দিল আখি ঠার
- - - - - - - - - - - -
দেখিআ ভাঁড়ুর প্রাণ করে দুরদুর।" (পৃঃ ১০৬)

২২) "অভয়া বলেন কালু লহ সিকা ভার

- - - - - - - - - - - -

তুমি আজ্ঞা দিলে মাতা কোড়িব চেয়ারে।" (পৃঃ ৬৪)

২৩) "তবক বেলক কাছে কামান কৃপাণ।" (পৃঃ ৮৮)

২৪) "দোয়াড়ি চেয়াড় বাণ তরয়ার খরসান

ভূষণ্ডি ডাবুস চক্রবাণ।" (পৃঃ ৮৯)

২৫) "পরিতোষে লহনার দিল পাট সাড়ী

পাঁচ পল সোনা দিল পড়িবারে চুড়ি।" (পৃঃ ১২০)

২৬) "খুঞ্যা পরাইআ পাট সাড়ী কৈল দূর।" (পৃঃ ১৩৮)

২৭) "তুলি তুলবাটী তৈল তাম্বুল তপনে

তরুণী তপন তসর তোয় বসনে।" (পৃঃ ২৯৩)

২৮) "খুল্লনার হাথে দিল আভরণ – পেড়ি

দোছটি করিআ পরে তসরের সাড়ি।" (পৃঃ ১৫৪)

২৯) "বাছিআ পরএ মেঘ ডম্বরু কাপড়।" (পৃঃ ১৫৫)

৩০) "ধরি নানা আভরণে অবশেষে পরে মনে

- - - - - - - - - - - -

স্বর্গের বিশাইয়ে স্মঙরণ।" (পৃঃ ৫৬)

৩১) "ফোঁটা পাটা মহাদন্ত ছিঁড়া জোড়ে কোঁচা লম্ব

শ্রবণে কলম খরসান।" (পৃঃ ৭৭)

৩২) "পার্বতী রূপবতী হরিদ্রাজুত ধূতি

পরিয়া বসিলা আসনে।" (পৃঃ ২০)

৩৩) "বসাইল জামাতারে লোহিত কম্বলে।" (পৃঃ ১২৪)

৩৪) "ধবল চামর বান্ধা উপরে টানায় চান্দা

- - - - - - - - - - - -

তার মাঝে নানা পাট ডোরা।" (পৃঃ ১৬১)

৩৫) "বহু ব্যয় করি কড়ি করিলাঙ খাট পাড়ি

- - - - - - - - - - - -

কারে দিব মন্দির মশারি।" (পৃঃ ১১৯)

৩৬) "পুত্রের বারতা পায়্যা শচী আনন্দিতা

উঠানে খাটাল্য পাট-কথুবার চাঁন্দা।" (পৃঃ ১০৯)

৩৭) "প্রভাতে উঠিয়া বীর পরে রাঙা ধড়া।" (পৃঃ ৪৭)

৩৮) "পরিধান বীর-ধড়ি মাথাএ জালের দড়ি

অঙ্গে লেপিত রাঙ্গা মাটি।" (পৃঃ ৮৮)

৩৯) "পা পোড়ে খরতর রবির কিরণ

শিরে দিলে নাই আঁটে খুঞার বসন।" (পৃঃ ৬১)

৪০) "পীত তড়িত বর্ণে হেম কুণ্ডলিকা কর্ণে

- - - - - - - - - - - -

কলেবরে মলয়জলঙ্ক।" (পৃঃ ১৬২)

৪১) "বীর হস্তে দেন দেবী মাণিক-অঙ্গুরী।" (পৃঃ ৬৪)

৪২) "হাড়মাল হইল কণ্ঠরত্নমাল।" (পৃঃ ২১)

৪৩) "দুই চক্ষু জেন নাটা খেলে টিকা কোট ভেঁটা
কানে শোভে ফটিক কুণ্ডল।" (পৃঃ ৪১)

৪৪) "দুবলা মার্জএ কেশ লয়্যা প্রসাধনি
- - - - - - - - - - - - -
বাছিআ পরএ মেঘডম্বরু কাপড়।" (পৃঃ ১৫৫)

৪৫) "জতনে পরএ রামা অঞ্জন সিন্দুর
মার্জন করিআ পরে মণিকর্ণপুর।" (পৃঃ ১৫৫)

৪৬) "হরিদ্রা কুমকুম লয়্যা ঘরে ঘরে বুলি চায়্যা
করিতে অঙ্গের মলা দূর।" (পৃঃ ১৫৭)

৪৭) "হরিদ্রা চন্দন তৈল আনিল দুবলা
খুল্লনার অঙ্গে দিআ দূর কৈল মলা।" (পৃঃ ১৫০)

৪৮) "দুবলা বুঝিআ কাজ আনিল বেশের সাজ
মৃগমদ কুমকুম চন্দনে।" (পৃঃ ১৬২)

৪৯) "করে ধরি আঙলা সুগন্ধি তৈল বাটী
সাধু বিদ্যমানে আইল পাটরাণির চেটি।" (পৃঃ ২৯৪)

৫০) "বরযাত্রী পড়ে সাড়া ঢেমচা দ্গাড়ী পড়া
বর বেড়ি করএ গমন।" (পৃঃ ১৫০)

৫১) "দেখিলাঙ অপরূপ সুগন্ধি অগৌর ধূপ
- - - - - - - - - - - - -
শঙ্খ ঘন্টা বাজে বীণা বেনি।" (পৃঃ ৮৭)

৫২) "তাতিনি তাতিনি তিনি মৃদঙ্গ মন্দিরা ধ্বনি
- - - - - - - - - - - - -
পিনাক বাজায় কুতুহলি।" (পৃঃ ১১০)

৫৩) "পটহ মৃদঙ্গ সানি দ্গাড় কাসর বেণি
- - - - - - - - - - - - -
অঙ্গভঙ্গে নাচয়ে নৃত্তকী।" (পৃঃ ১২২)

৫৪) "চৌদিকে ধাঁ ধাঁ বাজায় দামামা
- - - - - - - - - - - - -
কার কেহ নাঞি শুনে বোল।" (পৃঃ ৯১)

৫৫) "সাজ সাজ বলিআ দামায় পড়ে ঘা
- - - - - - - - - - - - -
জয় ঢাক বীর ডাক ব্যালিষ বাজনা।" (পৃঃ ২৭১)

৫৬) "গোমঞে লেপিআ মাটি আলিপনা পরিপাটী

চারিদিকে বান্ধবের মেলা।" (পৃঃ ৪৩)

৫৭) "পাইয়া ইনাম বাড়ী বুনে নেত পাট সাড়ী
দেখি বড় বীরের হরিস।" (পৃঃ ৮২)

৫৮) "শঙ্খ বান্যা কাটে শঙ্খ কেহ তার করে রঙ্গ
- - - - - - - - - - - -
সিংহাসন গড়ে পঞ্চদীপ।" (পৃঃ ৮২)

৫৯) "দরজি কাপড় শিঞে বেতন করিয়া জিঞে
গুজরাটে বৈসে এক পাশে।" (পৃঃ ৮৩)

৬০) "কুম্ভকার গুটরাটে হাঁড়ি কুঁড়ি গড়ে পিটে
- - - - - - - - - - - -
ভুনি খুনি ধুতি বোনে গড়া।" (পৃঃ ৮২)

৬১) "কিঙ্কর করিআ দিল দোলার সাজন
আগে পাছে লইআ পাকি শতশত জন।" (পৃঃ ১২৫)

৬২) "বায়ু-বেগে রথ জায় উভমুখে প্রজা জায়
- - - - - - - - - - - -
জিজ্ঞাসেন মায়ের বারতা।" (পৃঃ ১০৮)

৬৩) "অধিবাসের লইআ সাজ চলিল ঘটক রাজ
- - - - - - - - - - - -
গায়নে মঙ্গল গায় গীত।" (পৃঃ ১২১)

৬৪) "প্রথমে তুলিল ডিঙ্গা নামে মধুকর
- - - - - - - - - - - -
গোঁজে বান্ধ্যা এড়ে ডিঙ্গা লোহার সিকলে।" (পৃঃ ১৯৫)

৬৫) "সুকৃতি পুরুষ জিএ সুখভোগ হেতু
দুঃখ ভোগ করিবারে জিএ কালকেতু।" (পৃঃ ৫৪)

৬৬) "দারুণ দৈবের গতি সকলে দরিদ্র পতি
পড়িনু সম্বলচিন্তা ফাঁদে।" (পৃঃ ৫৪)

৬৭) "শুভযোগে মৃগ শিরা মেরু শৃঙ্গে জেন হীরা
- - - - - - - - - - - -
ইহা বিনু যাত্রা নাহি আর।" (পৃঃ ২৩০)

৬৮) "মকরে ধরণীসুত বুধে চান্দ গুরুজুত
- - - - - - - - - - - -
পিতার উদ্দিশ হয় হেতু।" (পৃঃ ২১৭)

৬৯) "বাহির হইতে সাধু বাজিল উছটা
- - - - - - - - - - - -
বামে ভুজঙ্গম দেখে দক্ষিণে শৃগালী।" (পৃঃ ২০১)

৭০) "সুবর্ণ-গোধিকা দেখি চিত্তে বীর হইলা দুখী

- - - - - - - - - - - -

কূর্ম গণ্ডা শশক সৈলক।' (পৃঃ ৫২)'

৭১) "বামবাহু নাচে তার ঘোরে বাম আঁখি।" (পৃঃ ৫৮)

৭২) "কপালে টনক নড়ে সুক্ষ্ম ধৃতি নাঞি উড়ে

- - - - - - - - - - - -

কালপেচা ডাকে চারি ভিতে।" (পৃঃ ২৬৩)

৭৩) "বামভাগে হালিসহর ডাহিনে ত্রিবিণী

- - - - - - - - - - - -

সন্ধ্যাকালে কোন নর দেহ ধূপদীপ।' (পৃঃ ২০১)'

৭৪) "অতি লঘু মোর পাপ দিলে গুরুতর সাঁপ

ব্যাধকূলে জনম নিশ্চয়।" (পৃঃ ৩৭)

৭৫) "ধনবান জার পতি সেই জায়া ভাগ্যবতী

- - - - - - - - - - - -

নরকে নাহীক পরিত্রাতা।" (পৃঃ ১৮৩)

৭৬) "অপুত্রক জার গারি তার ধনে রাজা বৈরী

প্রথম বাসরে উপবাস।" (পৃঃ ১৮৩)

৭৭) "তুহু পাপমতি বাঁজি হইলি অপযশ পাঁজি

কহ মোরে কেমন উপায়।" (পৃঃ ১৮৩)

৭৮) "মর‍্যা গেল ধনপতি হইল বহু দিস

মায়ের আইয়ত হাতে ভোজন আমিস।" (পৃঃ ২২৪)

৭৯) "বৈশাখ হইল মোরে বিষ

মাঁস না বিকায় সভে করে নিরামিষ।" (পৃঃ ৬১)

৮০) "খুল্লনার হাথে অগ্নি তুষার তুষার শীতলে।' (পৃঃ ১৮৮)'

৮১) "কাটা মহিষের আনে নাসিকার দড়ি

- - - - - - - - - - - -

মৌনে রহিব সাধু গোমুণ্ড সমান।" (পৃঃ ১২৩)

৮২) "পত্রিকার কলাগাছ রূপিবে অঙ্গনে

- - - - - - - - - - - -

বুড়ারে না করে গুণ মোহন-ঔষধ।" (পৃঃ ১৩৫-৩৬)

৮৩) "স্নান করহ তুমি ঔষধ খুঁজি আমি

হইব বংশধর তোর।" (পৃঃ ৩৯)

৮৪) "হুলাহুলি দিআ কইল নাড়ির ছেদন

- - - - - - - - - - - -

মনোহর বেশ কন্যা দিবসে দিবসে।" (পৃঃ ১১১)

৮৫) "ফেড়িআ চালের খড় জালিল আতুড়ি

গোমুণ্ড স্থাপিআ দ্বারে পুজে ষষ্টি-বুড়ি।" (পৃঃ ১১১)

৮৬) "ঘৃত দিআ সাদ ডোরা কাঁথে দিল বসুধারা
কৈল নান্দিমুখের বিধান।" (পৃঃ ১২৩)

৮৭) "দুই দলে আলাআলি চুলাচুলি গালাগালি
বরযাত্রী দেউটী না ছাড়ে।" (পৃঃ ১২৪)

৮৮) "শয্যা তেজি প্রভাতে উঠিল ধনপতি।
- - - - - - - - - - - -
শয্যা তোলা কড়ি মাগে পরিহাসী জন।" (পৃঃ ১২৫)

৮৯) "ব্যেবহার কৈল তাঁরে দিআ নানা ধন।
- - - - - - - - - - - -
বিদায় করিআ সাধু জ্ঞাতি বন্ধুগণে।" (পৃঃ ১২৫)

৯০) "কৌতুকে জৌতুক দেই জত বন্ধুগণ
- - - - - - - - - - - -
জত বন্ধুগণে সাধু করাল্য ভোজন।" (পৃঃ ১২৫)

৯১) "পণের নিয়ম কৈল দ্বাদশ কাহন
- - - - - - - - - - - -
ইহা নিআ আর কীছু নাঞি দিবে ফের।" (পৃঃ ৪২)

৯২) "জৌতুক ধনুকখান খর তিন গোটা বাণ
মুর্গাগুণ অঙ্গুলির তান।" (পৃঃ ৪৩)

৯৩) "দনাই পণ্ডিত সঙ্গে করিল বিচার
- - - - - - - - - - - -
ত্বরা করি যান লক্ষপতির ভবন।" (পৃঃ ১১৫)

৯৪) "গোলাহাটে সোধ দিল দ্বাদশ কাহন
কন্যা দরশনি দিআ করিল লগন।" (পৃঃ ৪২)

৯৫) "বার বৎসরের সুতা তোর ঘরে অস্থিতা
- - - - - - - - - - - -
পায় পিতৃ নরকে যন্ত্রণা।" (পৃঃ ১১৫-১৬)

৯৬) "সুরঙ্গ সিন্দুর ভালে চিরণি কুন্তল জালে
সঘনে নাড়েন আম্র-ডাল।" (পৃঃ ১৭)

৯৭) "পঞ্জর গড়াইতে গেলা করিআ পাশার খেলা
- - - - - - - - - - - -
পিতৃকার্যে দেহ ভায়্যা মন।" (পৃঃ ১৭৭)

৯৮) "জথা বিধি পিণ্ডদান শ্রাদ্ধ হইল সমাধান
- - - - - - - - - - - -
সাধু চলে বান্ধব পূজনে।" (পৃঃ ১৭৯)

৯৯) "দুবলা গণকগণে সম্ভ্রমে ডাকিআ আনে
- - - - - - - - - - - -

লিখে তারা শিশুর জাওয়াতি।" (পৃঃ ২১৭)

১০০) "কি কর কি কর ভায়্যা পাঁজি দেখ্যা আইনু ধায়্যা

- - - - - - - - - - - -

রবিবার তার প্রয়োজন।" (পৃঃ ১৭৭)

১০১) "নিবেদয়ে দ্বিজ তারে সব বিবরণ

- - - - - - - - - - - -

সভা বিদ্যমানে ওঝা পড়ে পাঁজি খান।" (পৃঃ ১২১)

১০২) "সঞ্জম কেতুর ঘরে উত্তরিল দ্বিজ

বরিল সঞ্জম তাঁর পদসরসিজ।" (পৃঃ ৪২)

১০৩) "পড়ে দত্ত শ্রীয়পতি সন্ধিমূল সন্ধিবৃত্তি

- - - - - - - - - - - -

একে একে পড়িল শ্রীপতি।" (পৃঃ ২২৩)

১০৪) "জীবনে যৌবনে বড়ই প্রীত

আদ্যের অক্ষরে দুই জনে মিত।" (পৃঃ ১৩৫)

১০৫) "লহনার বোলেতে খুল্লনা পড়ে পাতি

- - - - - - - - - - - -

কে লিখিল পাতি কপটবন্ধ।" (পৃঃ ১৩৭)

১০৬) "আশ্বিনে অম্বিকা-পূজা প্রতি ঘরে ঘরে

মহিষ ছাগল মেষ দিআ উপাচারে।" (পৃঃ ৬১)

১০৭) "চৈত্রমাসে পূজে হর নানা উপহারে

ঢাকঢোল বাদ্য বাজে শিবের মন্দিরে।" (পৃঃ ৩২)

১০৮) "ফাগুদোলে আনন্দে গোঙাব নিতে নিত।

- - - - - - - - - - - -

আনন্দে শুনিবে নাথ শ্রীকৃষ্ণচরিত।" (পৃঃ ২৯৩-২৯৪)

১০৯) "বিধাতা নির্মাণ ঘর নাঞিক দুয়ার

- - - - - - - - - - - -

হেঁয়ালি প্রবন্ধে কবিকঙ্কণ ভণে।" (পৃঃ ১২৭-১২৮)

১১০) "আয় বাছা আয় আয় আয়

- - - - - - - - - - - -

শ্রী কবিকঙ্কণ মুকুন্দ গায়।" (পৃঃ ২১৮)

১১১) "নগর্যা বালক সঙ্গে সদাই খেলে কড়া ডাঙ্গে

- - - - - - - - - - - -

জীবন মরণ নাহি গণে।" (পৃঃ ২২২)

১১২) "কালি রাঙ্গি পাশা সারি আনিল পার্বতী।

- - - - - - - - - - - -

হেন কালে মেনকার বাড়িল বিরস।" (পৃঃ ২৫)

১১৩) "সখা সঙ্গে ধনপতি আনন্দে পূর্ণিত মতি

- - - - - - - - - - - -

আগে জার আইসে তার জয়।" (পৃঃ ১১৪)

১১৪) "কি কব দুঃখের কথা গঙ্গা নামে মোর সতা

স্বামী তারে ধরিল মস্তকে।" (পৃঃ ৫৯)

১১৫) "সতিনি কন্দল করে দুগুণ বলিবে তারে

- - - - - - - - - - - -

সতিনির কি হইবে হানি।" (পৃঃ ৬০)

১১৬) "দেখিআ দারুণ সতা বিবাহ দিলেন পিতা

পিতৃকূলে হইলাঙ বিমুখি।" (পৃঃ ৫৯)

১১৭) "সন্তোষে বসায় খাটে দোষ দেখি নাক কাটে

দণ্ডে রাজা বনিতার পতি।" (পৃঃ ৬০)

১১৮) "মিথ্যা বাক্য হইলে কাটিব তোর নাসা।" (পৃঃ ৬২)

১১৯) "রন্ধনের তরে আমি আন্যা দিব দাসী।" (পৃঃ ১১৯)

১২০) "স্ত্রী গত যৌবনে পুরুষ নির্ধনে

কী বা আদরের চিন।" (পৃঃ ১২০)

১২১) "পরিতোষে লহনারে দিল পাট সাড়ি

- - - - - - - - - - - -

পূর্বে আছিলে জেন বিবাহের দিনে।" (পৃঃ ১২০)

১২২) "তোরে আশির্ব্বাদ প্রিয়ে পরম পিরিতি

- - - - - - - - - - - -

সেইকালে নৃপাদেশে করিল প্রবাস।" (পৃঃ ১৯৪)

১২৩) "মোর মনে লয় তথা হবে বহুকাল

- - - - - - - - - - - -

সেইকালে কেবা মোর হব অনুকূল।" (পৃঃ ১৯৪)

১২৪) "নিদয়ার সুখ বড় গৃহকার্যে বধূ দড়

কুলযশ রক্ষণের হেতু।" (পৃঃ ৪৪)

১২৫) "খুড়া হইআ দেই সতা কারে কব দুঃখ কথা

কারে বা করিব অভিমান।" (পৃঃ ১১৯)

১২৬) "হিতাহিত মনে গণ নাঞি লব কন্যা পণ

কেন ঝিয়ে করাবে দুর্গতি।" (পৃঃ ১১৭)

১২৭) "গণক কহিল মোরে দিবে দ্বিতীয় বরে

বিচারিএ বিধবা-লক্ষণ।" (পৃঃ ১১৭)

১২৮) "কেমন দেবতা এই পূজিস ঘটবারি

স্ত্রী লিঙ্গ দেবতা আমি পূজা নাহী করি।" (পৃঃ ১৯৮)

১২৯) "মোর ব্রত ভঙ্গ করি হইলী কুলের কালী

মায়্যা পূজা হইলী মোর ঐরি।" (পৃঃ ১৯৯)

১৩০) "মুক্তিপদে দিয়া মন শিব ভাবে অনুক্ষণ

- - - - - - - - - - - -

বারাণসী করিল পয়ান।" (পৃঃ ৪৪)

১৩১) "পর্বত কাননে বসি নাঞি পাট-পড়সি

- - - - - - - - - - - -

কন্যাগণে করিবেন বেভার।" (পৃঃ ১১)

১৩২) "পাইল বাপের গ্রাম শুনিঞা সতীর নাম

- - - - - - - - - - - -

শুনিয়া চণ্ডীর আগমণ।" (পৃঃ ১১)

১৩৩) "দক্ষের চরণে চণ্ডী করিলা প্রণতি

- - - - - - - - - - - -

চিরজীবী হৌক স্বামী সুস্থির সুমতি।" (পৃঃ ১১)

১৩৪) "হেন বরে গৌরী দিল কি দেখি সম্পদ

- - - - - - - - - - - -

আস্ত যাউক কন্যার পিতার চক্ষে পড়ুক ছানী।" (পৃঃ ২১)

১৩৫) "জদি বন্দীশালে মোর বার্য়য় পরাণী

মহেশ ঠাকুর বিনু অন্য নাহি জানি।" (পৃঃ ২১৪)

১৩৬) "না করিল কোন কর্ম বিফল দেবতা জর্ম

- - - - - - - - - - - -

যদি হব দেবাসুরে রণ।" (পৃঃ ৩৬)

১৩৭) "গুজুরাট একপাশে গ্রহ-বিপ্রগণ বৈসে

বর্ণদ্বিজগণ মঠপতি।" (পৃঃ ৮০)

১৩৮) "মূর্খ বিপ্র বৈসে পুরে নগরে যাজন করে

- - - - - - - - - - - -

জাবদ না পায় পুরস্কার।" (পৃঃ ৭৯)

১৩৯) "সদা লয় হরিনাম ভুমি পায় ইনাম

বৈষ্ণব বসিল গুজুরাটে।" (পৃঃ ৮০)

১৪০) "বৈদ্যক জনের পাশে অগ্রদানিগণ বৈসে

- - - - - - - - - - - -

হেমগর্ভ তিল লয় দান।" (পৃঃ ৮১)

১৪১) "ব্যাধ হিংসক রাড় চৌদিকে পশুর হাড়

- - - - - - - - - - - -

ছুঞিলে উচিত হয় স্নান।" (পৃঃ ৬২)

১৪২) "আইসে চড়িআ তাজি সৈয়দ মোলনা কাজী

পাঠান বসিল নানা জাত।" (পৃঃ ৭৮)

১৪৩) "মোললা পড়াইয়া নিকা দান পায় সিকা সিকা

- - - - - - - - - - - -

মখদ্দম পড়ায়ে পড়ানা।" (পৃঃ ৭৮)

১৪৪) "গুজুরাট নগরে ঘরে ঘরে শ্রাদ্ধ করে

- - - - - - - - - - - -

হাতে কুশে দক্ষিণা ফুরান।" (পৃঃ ৭৯)

১৪৫) "জতেক কায়স্থ দেখ ভাঁড়ুর পশ্চাতে লেখ

- - - - - - - - - - - -

মোর ঘরে করয়ে ভোজন।" (পৃঃ ৭৭)

১৪৬) "তোরে বলি প্রিয়ে বসি থাক গৃহে

- - - - - - - - - - - -

ধন রহে দিনা দশ।" (পৃঃ ১৮৩)

১৪৭) "অবোধ পরাণ নাথ বলি হে তোমারে

- - - - - - - - - - - -

ভুবন ভরিআ মোর রহিব কলঙ্ক।" (পৃঃ ১৮৪)

১৪৮) "করে ধরি করা ছুরি মুরগী জবাই করি

- - - - - - - - - - - -

দরে পায়ে কড়ি ছয় বুড়ি।" (পৃঃ ৭৮)

১৪৯) "বীরের তোলেন ঘর হইআ সাবধান

- - - - - - - - - - - -

নানা চিত্র লিখে বিশাই হইআ অনুকূল।" (পৃঃ ৭১)

১৫০) "সপ্ত মহলে তোলে চণ্ডিকার দেউল

নানা চিত্র লিখে বিশাই হইআ অনুকূল।" (পৃঃ ৭১)

১৫১) "অন্তঃপুরে সরোবর করিল নির্মাণ

পাষাণে বান্ধিল তার ঘাট চারিখান।" (পৃঃ ৭১)

১৫২) "উত্তরে খড়কি সিংহদ্বার পূর্বদেশে।" (পৃঃ ৭১)

১৫৩) "চারি চৌরি চতুঃশালা মাঝে পিড়া খো ঢালা

- - - - - - - - - - - -

দলিজ মসিদ নানা ছান্দে।" (পৃঃ ৭২)

১৫৪) "ধন্য রাজা মানসিংহ বিষ্ণুপদে লোল ভৃঙ্গ

গৌড়বঙ্গ উৎকল মহীপ।" (পৃঃ ৩)

১৫৫) "অধর্মী রাজার কালে প্রজার পাপের ফলে

খিলাত পাইল মামুদ সরিপ।" (পৃঃ ৩)

১৫৬) "উজির হইল রায়জাদা বেপারি বৈশ্যের খদা

- - - - - - - - - - - -

পাই লভ্য খায় দিন প্রতি।" (পৃঃ ৩)

১৫৭) "ডিহিদার অবুদ খোজ টাকা দিলে নাঞি রোজ

- - - - - - - - - - - -

টাকা দ্রব্য দশ দশ আনা।" (পৃঃ ৩)

১৫৮) "জিনিতে প্রজার মায়া পত্র নিবে এক ছিয়া

- - - - - - - - - - - -

পরিণামে দেই মহাদুঃখ।" (পৃঃ ৭৭-৭৮)

১৫৯) "সুন সুন রায় করিহে বিদায়

- - - - - - - - - - - -

না কর দেশের বিচার।" (পৃঃ ৪৬)

১৬০) "শুন ভাই বুলান মণ্ডল

- - - - - - - - - - - -

জনে জনে সাধিব সম্মান।" (পৃঃ ৭৬-৭৭)

১৬১) "বিষাদ ভাবিআ প্রজা করয়ে ক্রন্দন

- - - - - - - - - - - -

প্রথম আঘনে চাহি তিন তেহাই কড়ি।" (পৃঃ ৭৬)

১৬২) "আগুদলে যুবরাজ ধায় লঘুগতি

- - - - - - - - - - - -

চারিদিকে বেড়িল নগর গুজরাট।" (পৃঃ ৮৮-৮৯)

১৬৩) "ভেলিঞাতে উপনীত রূপরায় নিল বিত্ত

যদু কুণ্ড তেলি কৈল রক্ষা।" (পৃঃ ৪)

১৬৪) "সাধু নহষ ঢঙ্গ বেটা মিছা তোর ভরা

সাধুরূপে প্রবেশিআ ডাকা দিবি পারা।" (পৃঃ ২৫৩)

১৬৫) "সাত কোটি টাকা দেহ অঙ্গুরির মূল

- - - - - - - - - - - -

বাড়িবে তোমার ধন অভয়ার বরে।" (পৃঃ ৬৭)

১৬৬) "রতি প্রতি হইল বীর দশগণ্ডা দর

- - - - - - - - - - - -

চালু ডালি কিছু লহ কিছু লহ কড়ি।" (পৃঃ ৬৬-৬৭)

১৬৭) "পান দিআ সদাগর তারে দিল ভার

- - - - - - - - - - - -

তঙ্কা দুই চারি লৈয় বণিকের বাড়ি।" (পৃঃ ১৫৭)

১৬৮) "কিলিঞা নবাত ফেনি বিশা দরে কিনে চিনি

পান কিনে সহস্রের দরে।" (পৃঃ ১৫৭)

১৬৯) "জামাতারে বাপ মোর দিল ভূমি দান

তায় ফলে মাষ সরিসা তিল কাবাস ধান।" (পৃঃ ২৫)

১৭০) "দেশমুখ বলে ভাই শুন মোর বোল

সভে ভাস্যা গেল মোর কাপাস সাত ডোল।" (পৃঃ ৭৭)

১৭১) "বুলন মণ্ডল বলে শুন মোর ভাই
হাজিল বিলের শস্য তাহে না ডরাই।" (পৃঃ ৭৭)

১৭২) "সসুরা আছিলা রঙ্ক আনিতা চন্দন শঙ্খ
- - - - - - - - - - - -
কি বুঝাব অবলা তোমায়।" (পৃঃ ১৯৪)

১৭৩) "সপ্তগ্রামের বণিক কোথাহ না জায়
ঘরে বস্যা সুখমোক্ষ নানা ধন পায়।" (পৃঃ ২৩৮)

১৭৪) "বদলাশে নানা ধন নায়ে দেই ভরা
- - - - - - - - - - - -
কিনিঞা বহুতর পুরিল মধুকর লবণের পাতিয়া গোলা।" (পৃঃ ১৯৫-১৯৬)

১৭৫) "শত শত এক জায় গুজরাটে তন্ত্রবায়
ভুনি খুনি ধুতি বোনে গড়া।" (পৃঃ ৮২)

১৭৬) "মোজা পানঞি জিন নিরময়ে অনুদিন
চামার বসিল এক ভিতে।" (পৃঃ ৮৩)

১৭৭) "স্বকীয় চন্দন শঙ্খ দিআ হব নিরাতঙ্ক
- - - - - - - - - - - -
সুখে থাক নিজ জায়া সাথে।" (পৃঃ ১৯৩)

১৭৮) "বর্ধমান হৈতে বান্যা আইল ধূসর্দত
- - - - - - - - - - - -
সাতশয় বান্যা আইল ধনপতির ধাম।" (পৃঃ ১৭৮)

১৭৯) "কতেক ঘরে আনি লেখা নাঞি জানি
ডেরি অন্ন নাহি থাকে।" (পৃঃ ২৭)

১৮০) "কিরাত পাড়ায় বসি না মিলে উধার
হেন বন্ধুজন নাহি কেহ সএ ভার।" (পৃঃ ৫৩)

১৮১) "ভূতলে পড়িআ বারি গড়াগড়ি জায়
নিকট হইয়া সাধু ঠেলে বাম পায়।" (পৃঃ ১৯৮)

১৮২) "শিবপূজা করে জেবা দেবী পরায়ণ
আপনী সহায় তারে লক্ষ্মীনারায়ণ।" (পৃঃ ৩০৯)